KATA GHAT KATA GHATANA

By Biswa Bandhu Sanyal

স্মৃতির পর্দাখানি আর নতুন করে নাড়া খায় না। স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছে জীবনের দিনগুলি। জীবন-হাটের বেচাকেনার পালা শেষ করে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন নদীর ঘাটে, খেয়ার আশায়। কড়ি তাঁর ঐ হাটের বুক থেকে কুড়িয়ে নেয়া বিচিত্র মানুষ আর বিচিত্র তাদের জীবন কথা। তবুও সহস্রের ভিড়ে হারিয়ে যেতে চায় কত না বিশিষ্ট মুখচ্ছবি। কিন্তু হারায় না। বিঘূর্ণিত পৃথিবীর ছায়া পড়া চাঁদের মত সাময়িক অবলুপ্তি। তারপরই ভাস্বর হয়ে ওঠে তারা আপন মানবিকতার কিরণে। বিস্মৃতির ভয়ে ভীত মহিমবাবুর মুখে ফুটে ওঠে আবার স্নিগ্ধ হাসির রেখা। না, যে ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর স্মৃতির পটে, লালন ক'রে এসেছেন অতি সযতনে, কালের ধুলোয় এখনও আবছা হয়ে যায়নি তারা। একদিন দু'দিনের কথা ত' নয়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল গত। মলিন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবুও সমুজ্জ্বল তারা তাদের ধারকের ধারণ-যন্ত্রে। এইখানেই তার অহঙ্কার। তাঁর আহরণ শক্তির। নইলে হাকিমতো ছিলেন কাগজে কলমে। কোর্ট ঘরের মতই সাজান এজলাস। কিন্তু গণ্ডাকাটা চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। হাকিম বংশীয়দের ভেতরে আর কেউ নয় এতটা নির্বিষ। আইনের সাঁড়াশী দিয়ে এই হাকিমের কলমের বিষদাঁত তুলে ফেলেছে বৃটিশ রাজশক্তি আপন স্বার্থের খাতিরে। মামলা বলতেই স্থাবর সম্পত্তি। অস্থাবর ত' হালফিলের কথা। মফঃস্বল সহর থেকে রাজধানী কলকাতা, ছোট আদালত থেকে বড় আদালত সবগরম থাকত জমিজমা সংক্রান্ত মামলায়। মোটা মোটা অঙ্কের টাকা কোর্ট-ফিএর নামে স্ট্যাম্পের সুরঙ্গপথে চলে যেত সরকারের ঘরে। বৃটিশ সরকার দেখেছিল ভূমি হস্তান্তরের এই ক্ষুদ্র হাকিমের

হাতে যদি সামান্যতম ক্ষমতা থাকে তাহ'লে তারই শান্তি-বারির কল্যাণে বিচার দপ্তর পড়বে ঝিমিয়ে। কোর্ট-ফিএর নামে আসা স্থূল অঙ্ক ক্রমেই হারাতে থাকবে তার নধরকান্তি। শেষে হয়ত' পরিণত হয়ে যাবে তা অস্থিচর্মসার এক কাগুজে আইনে। সেই আশঙ্কাতেই সাব-রেজিস্ট্রার এজলাসে বসেও বিচারক নন। শুধুই হাকিম। অশিক্ষিত চাষীরা বলে 'মাটির হাকিম'!

সত্যিই মাটির হাকিম। কথাটি দ্ব্যর্থবোধক হলেও সত্যি। এবং তা একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছেন মহিমবাবু আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে। তখন তিনি সরকারের অনুমোদন পেয়ে পুরোপুরি সাব-রেজিস্ট্রার হয়ে বসেছেন চাকদার এজলাসে। অন্তরের অন্তঃস্থলে গুন্‌গুন্ করে এক হাকিমী মনোভাব। সরকারের মনোনয়ন পেয়ে 'প্রবেশনার' হওয়ার জন্যে যে হ্যাট কোট প্যাণ্ট ধার করতে হয়েছিল তাঁকে তা একটা লজ্জা-ক্ষত বলে মনে হয়। আফশোষ—যদি ওটাকে কোন রকমে চিরদিনের মত মুছে ফেলা যেত। চেষ্টারও কমতি নেই। কিন্তু অতীতের ক্ষতচিহ্ন ভবিষ্যতের বাজৈশ্বর্য দিয়েও চাপা দেওয়া যায় না। সুযোগ-সন্ধানী সে। ঠিক সময় বুঝে জ্বালা করে উঠে জানিয়ে দেয় কণ্টক-বিদ্ধ অতীতকে। তবুও ভুলতেই হবে। ফরমান যখন জুটেছে তখন সেবায় সন্তুষ্ট হলে অধিকারের [illegible] কি আর একটু বাড়বে না? বিশেষ ক'রে রাস্তা যখন রয়েছে সাব ডেপুটি কালেক্টর হওয়ার? শুধু একটু তদ্বির আর মনদিয়ে কাজ। সোপানের খোঁজ পেয়েও নীচের ধাপে পড়ে থাকবেন, তা কখনই হতে পারে না।

কিন্তু ভাবা এক আর কাজে করা আর এক। চাকদার-ই একটি ঘটনায় 'মাটির হাকিম'কে মাটিতেই রেখে দিল।

সেটা বোধহয় ১৯১৪ সাল। ডাক সাইটে মানুষ বাঁটুল বাঁড়ুজ্জে এসেছিল একটা জমি রেজিষ্ট্রী করাতে। সে ক্রেতা। বিক্রেতা

মদন মণ্ডল। বিঘে চারেক জমি। চাষের। চোখের জল মুছতে মুছতে দলিলে টিপসই দিয়ে দেয় মণ্ডল। একটু একটু করে সবই গিয়েছিল তার। এই চার বিঘেই ছিল শেষ সম্বল। বছরের না হলেও তু'মাসের খোরাক এরাই দিত তাকে। তাও আজ পরের হাতে তুলে দিতে হল তাকে তুই তুইটি মেয়েকে একই দিনে পার করবার আশায়। এই মেয়ে তুটিকে পার করতে পারলেই এ জীবনের মত দায় দায়িত্ব সব শেষ হয় তার। বুড়ো বুড়ি তুটি প্রাণীর যাহ'ক করে যাবেই চলে।

দলিলে টিপসই দিয়ে উঠেই হাত পাতে মণ্ডল, "এবারে দামের টাকাটা দিয়ে দিন বড়বাবু।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খিঁচিয়ে ওঠে বাঁটুল বাড়ুজ্জে, "দাম কি তোমার মেরে দেব নাকি আমি? আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি না?"

"তা দিয়েছেন," কিন্তু কিন্তু করে মণ্ডল, "তবে কিনা বাকী টাকাটা পেলে তবে দিন ঠিক করব বিয়ের।"

"করবে, বারণ করছে কে?" মোলায়েম হাসির একটি প্রলেপ দিয়ে দেয় বাড়ুজ্জে মণ্ডলের মুখের ওপরে, "আমাকেও নেমন্তন্ন করো বাপু, বুঝলে? তোমার যাতে একটু উপকার হয় সেইজন্যে জমিটা কেনা। নইলে ওর আর দাম কত? নাও, এই নাও আরও পঞ্চাশ।" দরাজ হাতেই আরও পঞ্চাশটা টাকা গুণে গুণে মণ্ডলের হাতে ধরে দেয় বাড়ুজ্জে। দেয় আর জিজ্ঞাসা করে, "কি এখন, মনে হচ্ছে কি যে টাকাটা আমি মেরে দেব?"

"না, না, মারবেন কেন?" লজ্জা পেয়ে যায় মণ্ডল নিজের ব্যবহারে। মানুষ চিনতে কি ভুলই না হ'য়েছিল তার।

"তাহলে চল, দলিলটা সেরেস্তায় জমা দিয়ে তোমার টাকাটা দিয়ে দি'।"

কিন্তু ঐ 'দিয়ে দি' পর্যন্তই। জোড়া মেয়ে পার করবার আশায় মাটির সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেও অবশিষ্ট চারশত টাকা পায়নি

মণ্ডল। দলিল রেজিস্ট্রী হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে চীৎকার ক'রে উঠেছিল সে, "আমার চারশ' টাকা এখনও পাইনি হুজুর।"

কথাটা শুনে আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিলেন মহিমবাবু। এমন ঘটনার সম্মুখীন এই প্রথম হলেন তিনি। অনেক দেখা, অনেক শোনার চাপে যৌবন হারিয়ে যায়নি তাঁর। তাই রক্ত এখনও বরদাস্ত করতে শেখেনি এ ধরনের শাঠ্যকে। দৃষ্টির শলাকা দিয়ে ক্রেতাকে বিঁধবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করেন, "টাকা দেননি আপনি?"

মরা মাছের মত ভাবলেষহীন মুখ বাঁটুল বাঁড়ুজ্জের। নির্বিকার ভাবেই জবাবে দেয়, "টাকা না দিলে কি আর কেউ দলিলে সই করে হুজুর?"

"না, না," কেঁদে ওঠে প্রৌঢ় মদন মণ্ডল, "আমাকে মাত্র একশ' টাকা দিয়েছে, আরও চারশ' টাকা পাব হুজুর। আপনার পায়ে পড়ি হুজুর, ও দলিল ছিঁড়ে ফেলে দিন।"

মানুষের আবেদন মনুষ্যত্বের দরবারে। শরাহত হংসী নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল সিদ্ধার্থের মানবতার ছায়ায়। আর এই প্রপঞ্চকের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না তিনি একটি গরীব চাষীকে! কঠিন স্বরেই বলে ওঠেন তিনি, "টাকা মিটিয়ে দিন এবং, নইলে এ দলিল রেজিস্ট্রী হবে না আপনার।"

"তাহ'লে রেজিস্ট্রী না হওয়ার কারণটা লিখে দলিলটা ফেরত দিতে আজ্ঞা হয় হুজুর।"

বাঁটুল বাঁড়ুজ্জের সাধনালব্ধ নির্বিকারত্ব ঘোচেনা। তার স্বরের হিমপরশ অনুভব করেন হাকিম আপন স্নায়ুর অবসতায়। বুঝতে পারেন, বড় কঠিন পাল্লায় পড়েছেন তিনি আজ। সইকরা দলিল একবার জমা পড়লে আর তা ফেরত দেবার আইন নেই। পারেন, একটিমাত্র ক্ষেত্রে। যদি বিক্রেতা শিশু, বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা বুদ্ধিহীন হয় তাহ'লেই শুধু দলিল ফিরিয়ে দিতে পারেন তিনি। তা নয় যখন

তখন তিনি বাঁচাবেন কি ক'রে মণ্ডলকে? উভয়দিকেই কর্তব্যের টান। চাকরী আর মনুষ্যত্ব। অবহেলা করবেন কোনটিকে? কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিনি ভাবতে থাকেন একি বিশ্রী অবস্থায় তাঁকে পড়তে হল আজ! খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর স্বপ্ন-সৌধ। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ এই প্রথম উপলব্ধি করেন তাঁর অসহায়তা। সব ছিল সিরাজের, ছিলনা শুধু একটি জিনিষ। সে হচ্ছে বিশ্বস্ততা। মহিমবাবুরও সব আছে। এজলাস, আর্দালা, বেঞ্চ-ক্লার্ক। নেই শুধু একটি জিনিষ। সে হচ্ছে আইন। নিরস্ত্র সৈনিকের অন্তরের জ্বালাভরা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন বাঁটুল বাড়ুজ্জের দিকে। তারপরই সচকিত হয়ে বলে ওঠেন, "ঠিক আছে, টিফিনের পর রেজিস্ট্রী হবে এটা।"

আবার হাউ হাউ ক'রে ওঠে মদন মণ্ডল আর সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার ক'রে ওঠেন তিনি, "থামঃ, কাঁদতে লজ্জা করছে না তোমার? টাকা না নিয়ে দলিলে সই করলে কেন বুদ্ধুর মত?"

ধমকানির পালা শেষ ক'রেই নজর দেন বেঞ্চ ক্লার্কের দিকে। "দেখি, আর কি কি আছে।"

টিফিনের সময় হ'তেই খাস কামরায় গিয়ে ঢোকেন মহিমবাবু। টেনে নিয়ে বসেন ১৯০৮ সালের ১৬নং এ্যাক্ট। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে থাকেন আইনের নির্দেশ। যদি কোথাও এমন কোন কথা বলা থাকে যা তাঁকে সাহায্য করতে পারে এই মদন মণ্ডলের মামলায়। কিন্তু পাওয়া যায় না কিছুই। বরঞ্চ উল্টোটাই মেলে। সেকশান ৫৮র ২ নম্বরএ স্পষ্ট নির্দেশ—If any person admitting the execution of a document refuses to endorse the same, the registering officer shall nevertheless register it, but shall at the same time

enhorse a note of such refusal. আবার সেকশান ৬৩র ২নম্বরএ ক্রেতা ও বিক্রেতার বক্তব্য লিখে, পড়ে শুনিয়ে তারপর সই করে দিতে বলছে। কিন্তু এতে কি সুরাহা হবে মণ্ডলের? আর, আর কি কিছুই নেই? সেকশানের পর সেকশান, ক্লজ, সাব-ক্লজ—কালো কালো এই অক্ষরগুলি কি কোন সাহায্যই তাঁকে করবে না? টিফিনের কৌটো পড়ে থাকে একপাশে। জলের গেলাস হাতে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে আর্দলী। হাকিম হাত ধুতে উঠবেন, সে জল ঢেলে দেবে হাতে। আইনের পরশরতন অন্বেষণকারীর কোন খেয়াল নেই সেদিকে। উল্টে চলেছেন পাতার পর পাতা। কাঁটাতারের গণ্ডিতে আবদ্ধ মনুষ্যত্ব ক্ষত বিক্ষত হ'তে থাকে মুক্তির উপায় অন্বেষণে।

পারেন নি রক্ষা করতে মদন মণ্ডলকে। সই করা দলিল ফিরিয়ে দেবারও ক্ষমতা হয়নি তাঁর। উপরন্তু সেই পাপের বোঝার ওপরে আপন নাম অঙ্কিত ক'রে দিতে হয়েছিল তাঁকে। আর সেইখানেই বিরাট আফশোষ তাঁর। যদি প্রতিবাদ স্বরূপ ইস্তফা দিতে পারতেন এই কাজে! তাও পারেন নি। বৃটিশ সরকার শুধু নোকরীয়ানা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার সঙ্গে দিয়েছে মোহের অঞ্জন।

তবুও চেষ্টা একবার ক'রেছিলেন তিনি নোটসীট চালু ক'রে। বলেছিলেন, জোচ্চুরি যেখানে স্পষ্ট, সেখানে অন্ততঃ জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা সাব-রেজিস্ট্রারদের থাকা উচিত। কিন্তু অফিস এমনই একটা রাজ্য যেখানে নিম্নস্থ ভুক্তভোগীদের মূল্যবান মতামতের চাইতে উচ্চপদস্থ অনভিজ্ঞের বক্তব্যের মূল্য অনেক বেশী। চালান দেওয়া নোটশীট কাটা-ঘুড়ির মত কোথায় ভেসে গেল তা আজও জানেন না মহিমবাবু। তবে এইটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে সিঁড়ির প্রথম ধাপই তাঁর শেষ ধাপ। নোটসীটের কুঠারঘাতে

আপন পদদ্বয়কেই তিনি করেছেন জখম। আর ওপরে ওঠা চলবেনা।

শুধু ওপরে ওঠাই নয়। বদলিও হ'তে হ'ল নদীয়াভূমি থেকে। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার শেষ রেলওয়ে স্টেশন ডায়মণ্ড হারবার। গড়তির মুখে তখন জায়গাটা। ধাপে ধাপে এগুচ্ছে পথ। কাকদ্বীপ তখনও নৌকোর পাল্লায়। সেখান থেকেই মাটির মানুষ আসে নৌকো বেয়ে ফেটি বাঁধা মাথা নিয়ে মহকুমা হাকিমেব এজলাসে বাদী বিবাদী হ'য়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের কল্যাণময় হস্ত তখনও তার স্পর্শ দেয়নি দেশের মনোজগতে। চাষীব সন্তান শেখেনি কালোবাজারের মারপ্যাচ। তাদের মুখে তখন একটি কথা, 'মাগী আর মাটি, এর জন্যে চাই লাঠি'। লাঠির দাপটেই তারা কবলে রাখে ঘরের বৌ আর চাষের ভূঁই। আর তার :জের টেনে এসে দাঁড়ায় হাকিমের এজলাসে।

মাঝে মাঝে 'মাটির হাকিমে'র এজলাসেও এসে দাঁড়ায় তারা। হাত বদল হবে জমি। তাও কখন সখন। জমি সহজে হাতছাড়া করতে চায়না চাষী। বুক দিয়ে আগলে রাখে যতক্ষণ পারে। ফলে এজলাসের সময় কাটে মহিমবাবুর গল্প ক'রে। আসেন শিক্ষক অনুরূপবাবু। আর আসে উকিল নীরোদ সামন্ত। ববাবরই অনুরূপবাবুর একটু সাহিত্য চর্চ্চার অভ্যাস। বর্তমানে সেটা চলেছে পূর্ণোদ্যমে। লেখা কাগজ হাতে নিয়ে এসে বসেন মহিমবাবুর খাস-কামরায়। কাজ না থাকলে মহিমবাবুও এজলাস থেকে উঠে এসে বসেন।

"কি মাষ্টার মশায়, ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল বুঝি ?"

"মাষ্টারীর ঐ একটা সুবিধে, বছরে ছ'মাসই বন্ধ। নইলে মাইনে যা দেয়"—বলতে বলতে হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েন অনুরূপবাবু, "আচ্ছা সাব-রেজিষ্টারবাবু, কারও জমি থাকবে

হাজার বিঘে আর কারও থাকবে না এক ছটাকও। এই নিয়ম আপনি মানেন ?"

"অন্তর অনেক কিছুই মানে না, কিন্তু আইনতঃ না মেনেও উপায় নেই," উত্তর দেন মহিমবাবু।

"ঠিক কথা, আইন মানলে এটাকেও মানতে হয়। কিন্তু বড়ই বেখাপ্‌পা মনে হয় এই অধিকারকে। লিখে ফেললাম ওবই ওপরে একটা গল্প। দেখাচ্ছি, প্রায় দেড় হাজার বিঘের এক জোতদার একদিন ছিল এক জমিদারের লেঠেল। লাঠির জোরেই সে রক্ষা করত ঐ জমিদারের মৌজা। তারপর একদিন সে জানতে পারল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ জমিদারের ঠাকুরদাকে জমিদার করেছিল শুধু তার লাঠির জোর আর দলীয় শক্তি দেখে। একটি শক্তিকে আপন বশে এনে ইংরেজ কোম্পানী শাসনাধীনে এনেছিল একটা বিরাট এলাকাকে।" কিন্তু গল্পের সারাংশ বলে খুশি হতে পারেন না অনুরূপবাবু তাই জিজ্ঞাসা করেন, "কাজ নেইত হাতে ?"

"বর্ত্তমানেত' নেই দেখছি," উত্তর দেন মহিমবাবু।

"তাহলে গোড়া থেকেই পড়ি শুনুন"।

গল্প পড়তে থাকেন অনুরূপবাবু। লেখার জোর আছে ভদ্রলোকের। যা তিনি বলতে চান তা দরাজ গলাতেই বলেছেন। ফাঁকি নেই। আর আছে তাঁর পড়বার ভঙ্গী। সুন্দর একটি সুরের আলিম্পন এঁকে চলেছেন স্বরের ওঠা-নামায়। শুনতে শুনতে হঠাৎ খেয়ালের বশেই জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু, "মাষ্টার মশায়, থিয়েটার ক'রেছেন কোনদিন ?"

প্রশ্ন শুনে পাঠ বন্ধ করে মাষ্টার মশায় তাকান প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে। তাঁর চোখেও প্রশ্ন। হঠাৎ এ জিজ্ঞাসার কারণ খুঁজে পাননা তিনি।

"এমনি জিজ্ঞাসা করলাম। আপনার পড়বার কায়দাটা বড় সুন্দর লাগছিল কিনা," প্রশ্নকর্তা তাঁর জিজ্ঞাসার কারণ দর্শান।

"করেছি। এখানেই। দু'বার। ষ্টেজের ওপরে স্রেফ পর্দা টাঙিয়ে। কিন্তু তা-ই লোকে খুব নিয়েছে দেখলাম। কলকাতায় গিয়ে দু'বার দেখে এসেছি গিরীশবাবুকে। আহা নাটক বলে ওকে," অনুরূপবাবু গিয়ে পড়েছেন যেন এক স্বপ্নরাজ্যে, সেইভাবেই বলে যেতে থাকেন, "মানুষের প্রাণের সঙ্গে সুর যদি না-ই মিলল তাহলে সে আর নাটক কিসের? ধরুন শকুন্তলা, তার যা কাব্য, যা অলঙ্কার, সে জ্ঞানী গুণী ছাড়া কে বুঝবে? আর ধরুন নীলদর্পণ। আমার আপনারই ঘরের ছবি। অবিশ্যি কারণও আছে। সেকালে রাজারাই নাটক করাত। বাছাই করা দর্শক। নাটকেরও সর্ব্বাঙ্গে তাই অলঙ্কার আর কাব্যের ছড়াছড়ি। যাইহোক, এই নাটককে গ্রামের ভেতরে পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। সেই চেষ্টাতেই আছি। তাও বড় কষ্ট। বহু কষ্টে একটা দল গড়েছি। তা পাড়াশুদ্ধ লোক আমাদের ঠেঙাবার জন্যে মুখিয়ে রয়েছে। শুধু পেরে উঠছে না বিশেষ বেচাল অবস্থায় আমাদের পাচ্ছে না বলে। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, নাটককে আমি দেখেছি একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে। সে কথা বোঝাতে গেলে বুঝবে না, শোনাতে গেলে শুনবে না মানুষে, সেই কথাই এর মাধ্যমে সুন্দর ক'রে বলা যায়।"

"এবারে পূজোয় তাহ'লে একটা নাটকের ব্যবস্থা করুন, দেখা যাক্।

"ভাবছি। করি ত' নাটক কিনে নিয়ে এসে আর নয়। কৃষ্ণ কান্তের উইল'এর নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করছি। পারি ত' 'ঐখানিই করব।"

"খুব ভাল কথা।" বলেই থেমে যান মহিমবাবু। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকেন অনুরূপবাবুকে। বয়সে তাঁরই সমান হবে। মৃতদার। তারপর আর ও পথমাড়াননি। কোন খেয়ালে এই একাকীত্ব বেছে নিয়েছেন কে জানে।

"মাষ্টার মশায় কি আর বিয়ে করবেন না বলে ঠিক করেছেন?" নাটকের আলোচনার ভেতর হঠাৎ এক খাপছাড়া প্রশ্নশুনে অবাক হয়ে যান অনুরূপবাবু।

"কেন বলুনত?"

"যৌবনের জোয়ারত' থিতিয়ে গিয়েছে দেখছি। এরপরই ধরবে ভাঁটার টান।"

"ভাঁটা কোথায়? ধাঁড়াধাঁড়ির বান যে এখন," বলতে বলতে এসে দাঁড়ায় নীরোদ সামন্ত।

এখানকার মানুষ নয় সে। বারুইপুরের কাছে কোথায় বাড়ি। ওকালতি পাশ করে ১৯০৬ সাল থেকে ডায়মণ্ড-হারবারবাসী হয়েছে। জাতে উকিল কিন্তু পেশা তার শুধু কেচ্ছা কুড়িয়ে বেড়ান। কোর্ট এলাকায় তাকে ঘোবাঘুরি ক'রতে খুব কমই দেখা যায়। তবে কোন সরস মামলার খোঁজ থাকলে আলাদা কথা। তখন সে রাত উপোসী বেড়ালের রান্নাঘরের দরজা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে সুড়ুৎ ক'রে ভেতরে ঢুকে যাবার মত এজলাসের দরজা খুলতেই ভেতরে ঢুকে জাঁকিয়ে বসে। আলোচ্য বিষয়ও তার ঘোরাঘুরি করে দুইটি বিষয়ের ভেতরে। নারী সংঘটিত ব্যাপার আর বিনা পরিশ্রমে রোজগার।

এই মানুষটি ঘরে ঢুকতেই মুখ বন্ধ ক'রে ফেলেছেন অনুরূপ-বাবু। মহিমবাবুর মনেও অবাঞ্ছিত অতিথি আগমনের অসন্তোষ। কিন্তু মুখে তার প্রতিফলন হ'তে দেন না তিনি। মাষ্টার মশায়ের কাহিনীর পশ্চাদ্‌পটে আর একটি জিনিষ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি —তা হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের নাটকের ইতিহাস। এই বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর জানবার কৌতূহল আছে। মেটাতে পারেন নি আজও। সুযোগ মিলেছিল আজ। মাষ্টার মশায়ের ভেতরে পেয়েছিলেন সেই ইতিহাসের খোঁজ। সেই সুরে বাঁধা তারের গায়ে বেখাপ্পা এক আঘাত ক'রে বসল মূর্তিমান এই বিঘ্নটি।

এই ১৯১৬ সালে ডায়মণ্ডহারবারের বুকে বসে কি লীলা-চলেছে তাঁর খোঁজ রাখেন ?” একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে সামন্ত।

“সামন্ত আমাদের কাদাখোঁচা পাখি।” সূক্ষ্ম হুল মাষ্টার মহাশয়ের কথায়।

“ঐ কাদা থেকেই ফসলের জন্ম মাষ্টার মশায়। শুক্‌নো খট্‌খটে জমিত’ বাঁজা।”

আঘাতটা সুন্দর ভাবে ফিরিয়ে দেবার আত্মপ্রসাদের হাসি সামন্তের মুখে। মাষ্টাব মশায় অপুত্রক। ধর্ণা দেওয়া থেকে হত্যা দেওয়া, এলোপ্যাথি থেকে সন্ন্যাসী, সব শেষ করতে যে হাঁপানি ধরেছিল তাঁর স্ত্রীর, তাইতেই শেষ হ’য়ে গেল একদিন।

“ববাববের কাদায় গাছের গোড়া যে পচে যায় গো সামন্ত, ফসল জন্মাবে কি ? যা জন্মায় তাও বিকৃত। আর কাদাখোঁচাও কি পারে সারাটা দিন কাদা ঘেঁটে বেড়াতে ? সেও জলে ডুব দিয়ে পবিষ্কার কবে নিজেকে। উড়ে উড়ে নীলাকাশের শোভাও দেখে মাঝে মাঝে। তারপর, কি লীলা কীর্তন ক’বতে যাচ্ছিলে, তাই কব, শুনি।”

উত্তর দেবেকি, সামন্তের তখন বেসামাল অবস্থা। হাসতে হাসতেই তাকে চরম আঘাত ক’রেছেন মাষ্টার মশায়। ইঙ্গিতটা খুব অস্পষ্ট নয়। এব একটা সুন্দব জবাব—মনের ভেতরে আতিপাঁতি ক’বে খুঁজতে থাকে সামন্ত। কিন্তু পায় না। আজ পর্যন্ত ঐ মানুষটির কোন দুর্বলতার খোঁজই সে পায়নি। নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে থাকে আপনার ভেতর আপনি।

“কিছু মনে ক’র না সামন্ত,” ক্ষতের ওপরে প্রলেপ লাগাতে থাকেন মষ্টার মশায়, “কথার পৃষ্ঠে কথা। স্রেফ রহস্যালাপ। বল, তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে। কি লীলা যেন চলছে বললে ?” বলে

ফিরে তাকান তিনি মহিমবাবুর দিকে, "আজ লীলাকীর্তনই হ'ক, কি বলেন মহিমবাবু ?"

"তা মন্দ কি। প্রতিদিনই কি আর নিরামিষ ভাল লাগে ? বলুন সামন্তবাবু।"

এ অনুরোধ শোনবার জন্যে নয়। সামন্তও বোঝে এ শুধ্ তার সদ্যপ্রাপ্ত আঘাতটাকে ভুলিয়ে দিয়ে সহজ ক'রে তুলবার চেষ্টা। কিন্তু মহিমবাবুর অনুরোধের পর না বলাটা ভাল দেখায় না। তা ছাড়া স্বার্থও আছে কিছু। কাজ করে সে জমি জমা হস্তান্তর সংক্রান্ত। সেখানে হাকিমের সঙ্গে এতটা দহরম মহরম আছে জানলে গেঁয়ো মানুষ তার কাজেই আসবে তাদের কাজের জন্যে। অতএব আরম্ভ করে সামন্ত— ।

হরিদাসী আর পবন গায়েন, সংসারে প্রাণী বলতে এই দুইজন। মা আর ছেলে। কাঠা নয় দশ জমি আছে তাদের এই বড় রাস্তার ওপরেই। সেই জমির ওপরে রাস্তার ধার ঘেঁষে উঠেছে একটি তেঁতুল আর বটগাছ জড়াজড়ি করে। তারই একধারে একটি এক-চালা। মাঝখানে বেড়া দিয়ে দুটো খোপ করা। থাকে হরিদাসীরা। আর আছে একটি ঢেঁকি। দশবাড়ির চাল চিড়ে কুটে দিয়ে যা পাওয়া যায় তাইতেই চলে যায় দুটি পেট। পবন দেখতেই বড়সড। বুদ্ধি ঠেক্ খেয়ে গিয়েছে কৈশোরের কোঠাতেই মায়ের অত্যধিক আদরের পাষাণে মাথা ঠুকে। ফলে চেহারা আর কাজে বিরাট অমিল তার।

সেই ছাপড়ার সামনে একদিন এসে দাঁড়াল এক প্রৌঢ় গেরুয়া-বসনধারী। হাড়ের গায়ে চামড়া জড়ান চেহারা। আর তার মেয়ে কাবলী। জোয়ারের ঢললাগা নদীর জল ঘোলা হ'লেও তার একটা রূপ থাকে। সেই রূপই কাবলীর।

এসে দাঁড়াল দু'জনে ভর দুপুর বেলা। ক্ষুৎপিপাসা-কাতর চেহারা। বয়ে নিয়ে আসা সামান্য সামগ্রী তেঁতুল-বট তলায়

নামিয়ে তারই ওপরে বসে পড়ে। ক্ষমতা নেই আর ঐ সামান্য সামগ্রীও টানবার। গঙ্গার ঘাট থেকে উঠে এইটুকু আসতেই গলাবুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

"এদের এখানে একটু জল পাওয়া যায় না বাবা?" কাবলী আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে।

"কি জাত তার ঠিক নেই—চোয়ালপড়া চিম্‌সে মুখখানা ঘৃণায় বেঁকে যায় গেরুয়াধারীর।

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে, ওদিকে জাতের বিচার করতে বসেছে! এ ধরনের আদিখ্যেতা সহ্য করতে পারে না কাবলী। বাপের কথার সঙ্গে সঙ্গে খিঁচিয়ে ওঠে সে, "দাদাত' খুব ভাল জাতের ছিল।"

"থাম্ তুই," ধমকে ওঠে প্রৌঢ়।

"কেন, থামব কেন? জল খাইয়েছে না? একেবারে কাকদ্বীপের গঙ্গার জল। আহা, কি মিষ্টি!" বলতে বলতেই সুর বদলে যায় তার, "আমি যাচ্ছি ওদের ওখানে। তুমি না খাও, আমি খাব।" হাঁটতে থাকে সে ছাপড়ার দিকে।

"যাবিনা কাবলী, বারণ ক'রে দিলাম কিন্তু," চেঁচিয়ে ওঠে কাবলীর বাবা।

সেই চীৎকার শুনেই ছাপড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে পবন। বেরিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়। সামনেই একটি মেয়ে। এমনভাবে ভরা যৌবনের মুখোমুখি হ'য়ে আর কখনও দাঁড়ায়নি সে। সহজ মনে প্রকৃতি-পরিচয়ের প্রশ্নও জাগেনি কোনদিন। অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সেই প্রকৃতির রূপ। এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কাবলীর। সামনে দৃষ্টির লেহন, পিছনে অপর দুইটি চোখের শাসন। কণ্ঠে তৃষ্ণা। 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা তার। ছুটে পালাবে, না এক ধমক দেবে সামনের মানুষটাকে, ভাবছে কাবলী, এমন সময় চেঁচিয়ে ওঠে পবন, "মা দেখ, কি সুন্দর একটা মেয়ে এসেছে।"

তৃষ্ণা মাথায় ওঠে কাবলীর। একি ধরণের অসভ্য মানুষরে বাবা! মনে ভাবলেও মুখে কখন বলে নাকি একথা? তার ওপরে তিরিক্ষে মেজাজ বাপ রয়েছে বসে। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে চোখ পড়ে ছাপড়ার দরজার দিকে। বেরিয়ে আসছে হরিদাসী পবনের ডাক শুনে। একজন বয়স্কা মেয়েছেলেকে আসতে দেখে সাহস ফিরে আসে কাবলীর। পবনের পাশ কটিয়ে এগিয়ে যায় তার দিকে।

"একটু জল খাওয়াতে পার?"

"কি জাত?"

"জলের জাত নেই।"

হেসে ফেলে হরিদাসী মেয়েটির উত্তর শুনে।

"তা জানি। তবুও আমাদের জল চলবে কিনা?"

"ভাল হলেই চলবে। আর কথা বলতে পারি না। আগে জল দাও দেখি।"

"দিচ্ছি" বলে আবার ছাপড়ার ভেতরে ঢুকে যায় হরিদাসী। একটু পরে একটা মাজা ঘটিতে করে জল নিয়ে আসে। তার হাত থেকে ঘটিটা একরকম ছিনিয়ে নিয়েই উঁচু করে গলায় ঢালতে থাকে কাবলী।

"খাচ্ছিস্!" তেতুল-বটতলা থেকে আতকে ওঠা স্বর শোনা যায় প্রৌঢ়ের। "বেশ জল," গলায় জল ঢালায় সাময়িক ছেদ পড়ে কাবলীর। "খাবে?" জিজ্ঞাসা করে সে।

"না।" এক নিদারুণ অপকর্মের বিরাট প্রতিবাদ করে যেন কাবলীর বাবা।

অতবড় যে 'না' তাও একসময় তলিয়ে যায় প্রয়োজনের অকূল সমুদ্রে।

জেদের বশেই মেয়েকে নিয়ে ঘুরেছিল জয়দেব একটা আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু সমস্ত দিনের অন্বেষণের ফল যখন নেতিবাচক



হল তখন নিজেকে একরকম টেনে নিয়ে এসেই ফেলল হরিদাসীর ছাপড়ার সামনে। এই জায়গা থেকেই সে জাত্যাভিমানের বশে মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। উপেক্ষা করেছিল মা আর ছেলের উপযাচক হয়ে আশ্রয় দানের প্রস্তাবকে। ঘুরে ফিরে আবার সেইখানে এসে দাঁড়াতেই মুচ্‌কি হেসে হরিদাসীর খোপের দিকে এগিয়ে যায় কাবলী।

কাবলী আর পবন গায়েনের কাহিনীর মুখপাত হল এটা।

অন্তর বোঝাই ঘৃণা নিয়ে ঐ গরীব গৃহস্থের দুটি খোপের একটি খোপ অধিকার করে বসে জয়দেব। একটি প্রয়োজন মিটল, এবার দ্বিতীয়টি—আহার্যের সংস্থান। ভোর হতেই বেরুতে হয় কাজের সন্ধানে। একা থাকে কাবলী বাবার নিষেধের একটা দুর্বল গণ্ডীর ভেতরে। জানে কাবলী যে তার বাবার ক্ষমতাও হবে না একমুঠো চাল জোগাড় করে আনবার। তাই নিজেই উপযাচক হয়ে ঢেঁকির গড়ের কাছে হরিদাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। চিড়ে কুটছিল হরিদাসী।

"আমি পাড় দিয়ে দেব মাসী ?" স্পষ্ট কিন্তু নরম গলা কাবলীর।

"অব্যেস আছে ?" তাকাবার উপায় নেই হরিদাসীর, হাত ছেঁচে যেতে পারে।

"বাড়িতে ছিল যে। কত কুটেছি।" আশ্রয়দাত্রীর কাছে এই প্রথম মিথ্যে কথাটা বলতে গলার স্বর একটু কেঁপেই যায় বুঝি কাবলীর। ঢেঁকি সে চোখেই দেখেছে শুধু, পাড় দেওয়া তার স্বপ্নেরও অতীত। জ্ঞান হয়ে অবধি দেখেছে বাপ তার গেরুয়া বসন পরে খুঞ্জুনি হাতে নিয়ে বের হয়। কাঁধে একটা ঝোলা। চলে যায় কাকদ্বীপের গভীরে। যেখানে চাষীরা নিয়ত লড়াই করে চলেছে মরণের সঙ্গে। আছে ম্যালেরিয়া, সাপ আর কখন কখন সুন্দর বন থেকে ছিট্‌কে আসা বাঘ। সেইখানেই

গিয়ে উপস্থিত হয় জয়দেব। শোনায় কৃষ্ণনাম, শোনে জমিজমার কথা। কৃষ্ণনাম শোনাবার নগদ দক্ষিণা জমে ঝুলিতে। জমিজমার কথার বেসাতি হবে কাছারি বাড়ি, নায়েব সুধাশঙ্কর ঘোষের সঙ্গে। এ পণ্যের কারবার দিনের আলোয় জমে না ভালো। তাই খবর যেদিন থাকে সেদিন রাত্রে কাছারি বাড়িতেই তার থাকবার ব্যবস্থা। রাত কাটিয়ে ভোরের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বাড়ি এসে পৌছয় সে।

বাবার এ ব্যবসার কথা সঠিক না জানলেও আন্দাজ করেছিল কাবলী। কাছারি বাড়ি থেকে জয়দেব ফিরে এলে বিশেষ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হ'ত সেদিন। আর কয়েকদিনের ভেতরেই বিশেষ একটা হালমা হ'য়ে যেত চাষীদের ওপরে। উচ্ছেদও যে কেউ কেউ না হ'ত তাও নয়। এই সব ঘটনার ভেতরে বিশেষ একটা সন্ধি-সূত্র আছে বলেই মনে হ'ত তার আর সেই কারণেই বাবার ওপরে কোন শ্রদ্ধাই তার জমতে পারেনি। তবুও মাথার ওপরে মাহুত না থাকলে চলে না। আর বনদেশের আইনও বনেড়া।

কাবলীর কাপা কাপা গলা শুনে সহানুভূতি জাগে হরিদাসীর মনে। হয়ত' কত কি-ই ছিল ওদের, আজ সব হারিয়ে পরের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

"কি আর করবে বাপু? সবই ভাগ্য।" গড়ের ভেতর হাত চালিয়ে এলে দিতে থাকে হরিদাসী, "আর কেউ নেই তোমার?"

"আছে এক দাদা আর বৌদি। তারাইত' আমাদের তাড়াল।"

"তাড়িয়ে দিল?" কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না হরিদাসী।

"দেবে নাত' কি আমাদের জন্যে টাকা খরচ করবে?"

"যাক্‌গে' বাপু, অত বুঝিও না। যেখানেই দেখি টাকা সেখানেই দেখি গণ্ডগোল। তার চাইতে এই ভাল আছি। তুমি

বস দেখি একটু এখানে, আমি ঝট্‌ ক'রে ন'কড়িবাবুর বাড়ি কালকের কোটা চালগুলো পৌঁছে দিয়ে আসি।"

উঠে যায় হরিদাসী কাবলীকে বসিয়ে দিয়ে। কিন্তু বসেই থাকে কাবলী। গড়ের ভেতরে হাত দেয় না। অতবড় ভারি জিনিষটা হাতের ওপরে পড়লে আর দেখতে হবে না।

ঘর থেকে চালের ধামা নিয়ে হরিদাসী চলে যেতেই বলে ওঠে কাবলী, "আমি পাড় দি, তুমি এলে দাও।"

"তোমার কষ্ট হবে।" পবনের হাঁ দৃষ্টি কাবলার মুখের ওপরে গেঁথে গিয়েছে।

"হ'ক কষ্ট। বাপের জন্মে ঢেঁকির ধারেও যাইনি, এখন এলে দিতে গিয়ে আঙ্গুলগুলো ছেঁচি আর কি। নাম, এদিকে এস।"

কাবলীর কথা অমান্য করবার শক্তি নেই পবন গায়েনের। পাড় দেওয়া ছেড়ে এসে বসে গড়ের সামনে। এসে বসে বটে, কিন্তু কাজের কাজ করতে গিয়েই পড়ে মুস্কিলে। সামনে দাঁড়িয়ে পাড় দিয়ে চলেছে কাবলী অথচ তার দিকে একবার ফিরে চাইবারও ক্ষমতা হয় না তার। হাসতে থাকে কাবলী ওর অবস্থা দেখে।

"বেশ হ'য়েছে। নারদ মুনিব তেলের বাটি সামলাও এবার।"

নারদমুনি যে বিষ্ণুর কথায় পরিপূর্ণ তৈলাধার হাতে ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ ক'রেছিলেন শুধু উছলে ওঠা তেল সামলাতে সামলাতে, দেখতে পাননি কোন কিছুই, সে গল্প জানে না পবন। আপন বুদ্ধি অনুযায়ী মেয়েটার হাসির একটা অর্থ ক'রে নিয়েই ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরে টানতে থাকে সে।

"তুমি ওখানে বস্‌বে।"

"আঃ, হাত ছাড়।" ভয়ে কাঁটা কাবলী। পবন বোঝেনা, কিন্তু 'ওত' বোঝে লোকের চোখে এই হাত টানাটানির কি অর্থ হতে পারে।

"না, ছাড়ব না," বলে আরও শক্ত ক'রে হাতখানা ধরতে গিয়ে খেয়ালী পবনের চিন্তা আর একদিকে বয়ে যায়।

"তোমার হাতটা কি নরমগো।"

"নরম!" মুখের ওপরে কাঠিন্যের ছাপ এসে পড়ে কাবলীর, "মারব একটা থাবড়া, দেখবে কি রকম নরম?"

"দূর বোকা, মেয়েরা বুঝি মারে? মারেত' ছেলেরা। হ্যাঁ গো, আমি দেখেছি যে। বাবা কেবলি পেটাত' মাকে।" অতীতের কোন এক দৃশ্য অন্যমনস্ক করিয়ে দেয় পবনকে। খেয়ালে হাত ধরা, খেয়ালেই আবার ছেড়ে দেয় সে। বলতে থাকে, "আমিও একদিন বাবাকে দিয়েছিলাম এক ঘা। উঃ কি রক্ত! বাবাত' অজ্ঞান, আমিও পঁইষট্টি। ক'দিন পরে মাইত' ধরে নিয়ে এল আমাকে একটা নৌকোর ভেতর থেকে।"

এমনি ভাবেই জমে উঠতে থাকে তাদের আলাপ। কাবলী দেখেছে পবন মা ছাড়া বোঝে না। আর সরল। সরলও ঠিক বলা চলে না, সহজ বুদ্ধির অভাব তার যথেষ্ট। তবুও মানুষটাকে কেমন ভাল লাগে। এ ভাল লাগার কোন কারণই হয়ত' সে দর্শাতে পারবে না। তবুও মনের ওপরে হাত চলে না। মানুষ বলে ভাগ্য। সেই ভাগ্যের সঙ্গেই খেয়ালের খেলা খেলে কাবলী। সুযোগ পেলেই বায়না ধরে—

"পবনদা, তোমাদের দেশে পেয়ারা গাছ নেই কেন?"

"আছেত'।"

"ছাই আছে। আমাদের কাকদ্বীপে কত পেয়ারা গাছ। এখানে একটাও যদি থাকে।"

"জানে না শোনে না, বললেই হ'ল 'নেই'। পেয়ারা বাগান এখেনে—" বলতে বলতেই হাঁটা দেয় পবন পেয়ারার খোঁজে।

সেদিকে তাকিয়ে মুচ্‌কে হাসে কাবলী। এ মানুষটার মাথায় কি একটুও বুদ্ধি নেই? তাহ'ক, ও জিনিষটা যত কম থাকে ততই

ভাল। বুদ্ধি আছে তার দাদার। আর সেইজন্যেই আজ তাদের এই অবস্থা। খুদকুঁড়ো যা ছিল বাবাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সমস্ত নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। তারপর সুযোগ বুঝে একদিন রাত্রে সামান্য দু'চারটি জিনিষ সঙ্গে দিয়ে তাদের তুলে দিয়েছে ডায়মণ্ডহারবারগামী এক নৌকোয়। হয়ত' না খেয়েই মরতে হ'ত তাদের। শুধু এখানে এসে পড়েছিল তাই বেঁচে গিয়েছে। পবনরা প্রাণ দিয়েছে তাদের। হাসি হাসি মুখে কাবলীর কৃতজ্ঞতার ছাপ।

সদর রাস্তার ধারেই বাড়ি পবনদের। তাই সদরের ঘটনা পাড়া প্রতিবেশির নজরে যেমন পড়ে তেমনি আলোচ্যবস্তুও হ'য়ে ওঠে অতি অল্পদিনেই। প্রেমের ঘটনা অন্যের ঘরে ঘটলেই তা মুখরোচক। তারই একটু আস্বাদ পাইয়ে দেয় নীরোদ উকিল মাষ্টার মশায় আর মহিমবাবুকে।

"কি হ'ল? শেষ হ'য়ে গেল ঘটনা?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাব।

"না, না, এখনই শেষ হবে কি? চলছে। চলুক, দেখি আগে শেষ দৃশ্যে কি হয়, তারপর আবার জানাব।"

"জানাবেন কিন্তু মনে করে। আপনার কাবলী আমাদের কৌতূহল সৃষ্টি ক'রে রাখলো।"

"শুধু আপনাদের কেন, অনেকেরই। যৌবন জিনিষটাই যে কুতূহলী।" উঠে দাঁড়ায় নীরোদ সামন্ত, "চলি সার। এখুনি একটা ট্রেণ আসবে। সেই ট্রেণে ন্যাট্রা থেকে আমার একজন বড়লোক মক্কেল আসবার কথা আছে।"

চলে যায় উকিল। আর শ্রোতা দুইজন নির্বাক বসে থাকেন। যে ঘটনা তাঁরা শুনলেন এইমাত্র তার ভেতরে কেচ্ছা নেই, আছে ভাললাগা। হয়ত' এই ভাললাগাই পরে ভালবাসায় পরিণত হ'তে পারে। কিন্তু তার ভেতরেও জঘন্যতা কিছু থাকবে বলে

মনে হয় না। পবন আর যাই হ'ক বদলোক নয়। আর কাবলীর ভেতরেও খুঁজে পাওয়া যায় একটি সতর্ক মন। নইলে সুযোগ তাদের প্রচুর থাকা সত্বেও তারা দাঁড়িয়ে থাকতনা একই জায়গায়। তবুও এদের নামে কুৎসা রটাতে দ্বিধা করেনা মানুষ।

"আমার কিন্তু মনে হয় ঐ গেরুয়া বসনধারীই ঘোঁট পাকাবে এর পরে," বলে ওঠেন অনুরূপবাবু।

"আশ্চর্য নয়," সায় দেন মহিমবাবু, "বাপের যে নমুনাটুকু পাওয়া গেল তা খুব সুবিধের বলে মনে হল না।"

আর এগুতে পারে না কথা। একখানা সরকারী চিঠি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় বেঞ্চ-ক্লার্ক হরনাথ। তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে চোখ বুলিয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে যান মহিমবাবু।

"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো," আপন মনেই বলে ওঠেন তিনি।

"আবার কি হ'ল? বদলি নাকি?" জিজ্ঞাসা করেন অনুরূপবাবু।

"না, বদলি নয়। তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। আলিপুর সদর রেজিস্ট্রী অফিস জানাচ্ছে যে সেখানে গিয়ে জমি রেজিস্ট্রী করিয়েছে সুদর্শন গুই। তাই ভাবছি লোকটা দ্বিগুণ ফি দিয়ে ওখানে রেজিস্ট্রী করাতে গেল কেন?"

প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। নিজের এলাকা ছেড়ে সদর অফিসে গিয়ে বা প্রেসিডেন্সি রেজিস্ট্রেশান অফিসে দ্বিগুণ ফি দিয়ে সহজে রেজিস্ট্রী করাতে যায় না কেউ। এ আইন তৎকালীন কর্তারা করেছিলেন বোধহয় শুধু তাদের কথা চিন্তা করে যারা কার্যব্যপদেশে বিদেশে থাকতে বাধ্য হয় আর প্রয়োজনের খাতিরে সেখান থেকেই রেজিস্ট্রী করতে হয় দেশস্থ জমি বা বাড়ি বা অস্থাবর কোন সম্পত্তি। তবুও কথা হচ্ছে আইনের বিশ্বকর্মা সুরক্ষ কক্ষ নির্মাণ

করলেও সরকার আদেশে রেখে দেয় সূচিদেহ পরিমাণ ছিদ্র নইলে মামলার সাপ ঢুকতে পারে না যে।

"আচ্ছা, সুদর্শন গুঁইত সেই লোকটা যে মিথ্যে মামলার সাফাই সাক্ষী দিয়ে বেড়ায়?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"সেই রকমই শুনেছি", উত্তর দেন অনুরূপবাবু।

"তাহলে আর দেখতে হবে না। দেখুন এই কেঁচোর গর্ত্ত থেকে আবার কি সাপ বেরোয়। চলুন উঠি। পাঁচটা বাজল।" উঠে দাঁড়ান মহিমবাবু।

সাপই বের হয়। তাঁর এই ছোট্ট চাকরী জীবনে কত দৃশ্যই না প্রত্যক্ষ করলেন! পুরাণের যুগে যেমন ছিল গো-ধন। চুরি, ডাকাতি থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে ঐ এক গো-ধন নিয়ে। তেমনি এখন হ'য়েছে ভূ-সম্পত্তি। একজনের জমি আর একজন ফাঁকি দিয়ে নেবার জন্যে কতরকম ছলচাতুরির আশ্রয়ই না নিচ্ছে! সব কিছু তাঁর নজরে আসে না। আসবার কথাও নয়। রেজিষ্ট্রী করা নিয়ে কথা। সেইটুকু হ'য়ে গেলেই এ এজলাসের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ফুরিয়ে গেল লেনদেনকারীদের। তারপরের ইতিহাস গড়ে ওঠে ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে। তবুও 'রাজা কর্ণেন পশ্যতি'র মত তিনিও কান দিয়েই দেখেন এখানকার এই রেজিষ্ট্রীর ছোট্ট বীজটুকু কি মহীরুহ প্রসব করল আর এক দরবারে গিয়ে। নিজেও সে প্রত্যক্ষ করেন না একেবারে তাও নয়। এমন কতকগুলি কাজ আসে যা তিনি করতে বাধ্য হন ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও। বেশিদিন নয়, মাস কয়েক পরের কথা। শাহীদান বিবি এসেছিল একখানা দরখাস্ত নিয়ে। সঙ্গে তার চাচা। কি ব্যাপার? না, সে তালাক দেবে তার শওহরকে। সেই তালাক নামাই রেজিষ্ট্রী করাতে এসেছে সে। আইনতঃ সিদ্ধ নয় এটা। মৌলবী কাজীর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সমাজের সম্মতি অভাবে তালাক মুসলমান আইনে

অসিদ্ধ। একথা মহিমবাবু যেমন জানেন তেমনি ওরাও জানে। তবুও সে তালাকনামা রেজিষ্ট্রী করে দিতেই হয়। তার জন্যে ছাপান ফর্মের ব্যবস্থা করেছে বৃটিশ সরকার। সেই ফর্মে দরখাস্ত, সঙ্গে উপযুক্ত 'ফি'। 'না' বলবার রাস্তা নেই তাঁর। তবুও একবার জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু, "তোমার আবার কি হ'ল বাপু?"

"আজ্ঞে, মারে হুজুর," উত্তর দেয় শহীদান বিবি তার বোরখার অন্তরাল থেকে।

ঐ উত্তর পর্যন্তই। সত্যিই মারে কিনা তা জানবার কোনও রাস্তা নেই। বোরখাকে ওরা ধর্মের অঙ্গের সমান ভাবে। যদিও এরকম ভাবার ভেতরে কোনও কারণ খুঁজে পান না তিনি। ট্রেণ চলাচলের রাস্তায় কত বোরখাধারিনীকে দেখেছেন মুখের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করতে। কিন্তু এজলাসে দাঁড়িয়ে তালাকের কারণ জানালেও হাকিম পারেন না ঐ আবরণ উন্মোচনের কথা বলতে। ধর্মীয় অভিমানে আঘাত করবার হুকুম তাঁর নেই। অতএব রেজিষ্ট্রী হয়ে গেল 'তালাক'।

আর শহীদানের স্বামী আব্দুল কাদের তখন গো-যানের ছৈএর ভেতরে বিছিয়ে দেওয়া বিচুলীর ওপরে মাদুর পেতে শুয়ে চোখ বন্ধ ক'রে স্বপ্ন দেখছিল তার যুবতী স্ত্রীর। শ্বশুর নেই। খুড়ো শ্বশুরই মানুষ করেছে শহীদানকে। বিয়েও দিয়েছে সে-ই। সুন্দরী স্ত্রীর জন্যে যথেষ্ট টাকাও খরচ ক'রেছে কাদের। আর করবে নাই বা কেন? আল্লার দোয়ায় আছে তার যথেষ্টই। ছিল না যা তাও হয়েছে এতদিনে।

বিয়ের এক বছর পরে শ্বশুর বাড়িতে স্ত্রীকে পাঠিয়েছিল কাদের। তাও খুড়ো শ্বশুরের অনেক করে বলে যাওয়ার পর। আনতে যাওয়ার মুখেই এই ইতিহাস।

খবর ছোটে বাতাসের আগে। বিশেষ ক'রে তাতে যদি কোন রসের ভিয়েন থাকে। তা সে মিলনান্তই হ'ক অথবা বিয়োগান্তই হ'ক। সরারহাট থেকে ডায়মণ্ড হারবার অনেকটা পথ। বিশেষ করে গো-যানের ব্যবস্থায়। বেলা চড়বার আগে রওনা দিয়েও বিকেলের মুখে এসে পৌঁছুতে পারেনি কাদের। তখনও মাইল-খানেকের পাল্লা। এমন সময় দেখা হয়ে যায় এক সন্দেশ-বাহকের সঙ্গে। পুলকিত কাদের। শ্বশুরবাড়ির দেশের মানুষ। বড় আপন জন।

"সেলাম আলেকুম জালিম মিঞা। খবর ভাল?"

"আলেকুম সেলাম। আমার ভাল, তোমার ভাল না।"

জালিম মিঞার কথা শুনে চম্‌কে ওঠে কাদের। দুশ্চিন্তার স্বাভাবিক কারণটাই হয়ে ওঠে অসুস্থতা। সেই ভয়ই হয় কাদেরের। শহীদান অসুস্থ হয়ে পড়েনিত'? সেই কথাই জিজ্ঞাসা করে সে।

"না অসুখ বিসুখ কিছু নয়। তবে কথা হচ্ছে ওখানে তুমি সাদী না করলেই পারতে। ওর চাচা লোকটা খুব সুবিধের নয়। মেয়ে বেচা ব্যবসা করে।"

"যা ইচ্ছে, করুক, তাতে আমার কি?"

"তোমার কি তা গেলেই জানতে পারবে।' এগুতে যায় জালিম আর লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে তাকে গিয়ে চেপে ধরে কাদের।

"কি হয়েছে বল।"

কাদেরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে তার হাতটা ছাড়িয়ে দেয় জালিম।

"শহীদান তোমাকে তালাক দিয়েছে। ওর চাচাই এটা করাল।" আর দাঁড়ায় না সেখানে জালিম।

দাঁড়ায়নি আর কাদেরও। সেখান থেকেই ফিরে গেল তার গরুর গাড়ি সরারহাটের দিকে।

তারপর পনেরটা দিনও পার হয়নি, এক দরখাস্ত আর দেয় ফি জমা পড়ল সরকারের ঘরে। মৃত্যুপথযাত্রিণী আয়েজান বিবি তার জমি জমা দান করে যাবে। এই সময়ই সময়। 'কাল করব' বলে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি গড়বার ভুল করতে চায় না সে। অথচ সশরীরে হাকিমের এজলাসে গিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই তার। তাই তার আর্জি সরকারের কাছে—সরকার বাহাদুর যেন উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাহার দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ হাকিম বাহাদুরকে এখন চোদ্দ মাইল রাস্তা গরুর গাড়ি চড়িয়া সমস্ত দেহে বাতের বেদনা ঘটাইয়া আয়োজন বিবিকে খুশি করিতে যাইতে হইবে।

দরখাস্ত পাঠ শেষ করেই এজলাসের দিকে তাকান মহিমবাবু। নেই। মনে পড়ে একটু আগেই জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে বলে হরনাথ ছুটি নিয়ে গিয়েছে। নিঃশব্দে একটু হাসেন মহিমবাবু। জ্বর হওয়াটা আশ্চর্যের নয় কিছু। সামান্য রাহা খরচের লোভে কে যাবে ঐ মরণ ফাঁদে পা গলাতে। ফলতা অঞ্চলের ম্যালেরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোরাদের খাতির করেনি। হরনাথত' তাদের কাছে দুগ্ধপোষ্য। সুতরাং হাকিম সাহেব নিজেই—

অজানিতপূর্ব এক পরিস্থিতি।

ফলতা লাইট রেলওয়ের লাইন ডিঙিয়ে কাচা সড়ক ধরে ক'মাইল। তারপর ডাইনে বেঁকে মাঠের বুকে নেমে পড়েছিল গাড়ি। রাস্তা নেই আর। যা আছে তা কাদা আর গর্ত্ত। টাল খায় গো-যান। আর ছৈ-এর ভেতরে বসা মহিমবাবুর সমস্ত দেহ গুলিয়ে উঠতে থাকে। বেলা দ্বিপ্রহরে যে যাহার ঘরে মোটা চালের ভাত আর পলাণ্ডু সহযোগে ব্যঞ্জন নিয়ে বসে গিয়েছে দ্বিপ্রাহরিকের ব্যবস্থা করতে। এধারে ওধারে রোয়া ধানের ক্ষেত। দীঘল হ'য়ে উঠেছে। ভাদালের মাথায় কচি সবুজ শিষের রেখা

দেখা যায়। আষাঢ়স্য প্রথম দিবস পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধারা নামেনি এখনও। যা হচ্চে তা ভাদ্র আশ্বিনের ছেঁড়া মেঘের দেহের স্বেদ-কণা। নৌকোর এ গুলুইএ রোদ ও গলুইএ বৃষ্টি। ডায়মণ্ড হারবার শুক্‌নো খট্‌খটে। পথে আসতে পেয়েছেন এক পশলা। এখানে আবার রোদ। গা-পোড়া গরম। তবে রাস্তার নমুনা দেখলে মনে হয় ঢেলে গিয়েছে হয়ত' একদিন আগে। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সবুজের ওড়না ঢাকা পৃথিবী। দেখে মনে হয় না যে মানুষের বসতি কোথাও আছে। নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যকে দোষারোপ ক'রতে ক'রতেই বুঝি একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন মহিমবাবু। এমন সময় কে বলে ওঠে—"এখানেই নামতে হবে হুজুর।"

"এ্যাঁ?" চম্‌কে ওঠেন মহিমবাবু। দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কাজীর হুকুমে নিয়ে আসা হ'য়েছে তাঁকে বধ্যভূমে। শেষ ব্যবস্থার জন্যে ব্যস্ত জিহন আলী খাঁ বুঝি তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যেতে এসেছে বিশেষ জায়গাটিতে।

"আয়েজান বিবির বাড়ি এসে গিয়েছেন হুজুর," লোকটি আবার বলে।

"ও," বাইরে বেরিয়ে আসেন মহিমবাবু। একবার মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখেন। সূর্য মধ্যমাকাশে। এখুনি কাজ সেরে ফিরতে পারলে সন্ধ্যার পরেই হয়ত' পৌছুন যেতে পারে ডায়মণ্ড হারবারে। কিন্তু সব কিছুর আগে যা চাই তা হচ্ছে একটু জল। বাড়ি থেকে যা নিয়ে এসেছিলেন তা এই দীর্ঘ সফর পথে ঢোক ঢোক ক'রে গিলেই শেষ হয়ে গিয়েছে। নিঃশেষিত পাত্রটির দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েই বলে ওঠেন, "এখানে জল পাওয়া যায় না?" "তাহলে আর বেঁচে আছি কি করে হুজুর?" মিশকালো মানুষটির শ্বেত-দশন-পংক্তি দেখা যায়।

"তাহলে তারই একটু ব্যবস্থা করতে পারবে?" ধৈর্য মানে না আর।

"আসুন হুজুর। বিশ্রাম করুন, তারপর সব ব্যবস্থাই হবে।"

অগত্যা। ছোট একটি বাগানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল গাড়ি। এখন সেই বাগান পেরুতেই দেখা যায় ওধারে কয়েক ঘর গৃহস্থের বাস। তারই একটির সামনে এসে দাঁড়ান তাঁরা। কয়েকজন পূর্ণ বয়স্কলোক আর কয়েকটি শিশু উঠোনের ওপরে দাঁড়িয়ে। একান্ত আপনার জন কোন মুমূর্ষু রোগীকে গৃহাভ্যন্তরে রেখে তারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনের ওপরে ডাক্তারের আশায়। নিস্তরঙ্গ পরিবেশ। সামান্য শব্দেরও অভাব। বধ্যভূমে উপস্থিত জনতা কি উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেষ দৃশ্যটি দেখবার আশায়?

"হারু, দুটো ডাব পাড়।" হুকুম করে সঙ্গের লোকটি।

এতক্ষণে বাড়িটির চতুর্দিকে দেখবার অবসর পান মহিমবাবু। হ্যাঁ, ডাব আছে বটে বাড়িটিতে। কাঠা পনের জমির ওপরে গোটা চারেক ঘর। তার পাশেই একটা ছোট্ট পুকুর। আর এই সবটুকু জমি ঘিরে রয়েছে প্রায় গোটা চল্লিশ নারকেল গাছ।

শুধু হুকুমের ওয়াস্তা। ডাব আসতে বিশেষ দেরি হয় না। নারকেল গাছের ছায়ায় বেঞ্চির ওপরে বসে ডাবের জল খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করেন মহিমবাবু। মনে হয় তাঁর এই গাছ কয়টিই বাঁচিয়ে রেখেছে এ সংসারের প্রাণী কয়টিকে। নইলে ঐ ডোবার জল খেয়ে বাঁচতে পারত না এরা। খাবার জলের অন্য কোন ব্যবস্থা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন একটি ভাল পুকুর আছে প্রায় আধ মাইল দূরে। তবে একটা টেপাকল নাকি হবে হাটের ওপরে। তাও সে প্রায় দেড় মাইলের ধাক্কা। এবম্বিধ জলের অবস্থা যেখানে, সেখানে মানুষ বাস করে কি ক'রে ভেবে নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে যান মহিমবাবু।

"আসুন হুজুর," অত্যন্ত বিনয় সহকারে হুকুম করে সেই মানুষটি। নাম জানা নেই তার। তাতে কিছু এসে যায় না। শুধু তার কথা বলবার ভঙ্গিটির ভেতরে বিনয়ের আবরণ ভেদ ক'রে উঁকি মারে এমন এক কাঠিন্য যা তাঁর হাকিম সুলভ অভিমানে বড় বাধে। কিন্তু নাচার। পাল্লায় যখন পড়েছেন খানা তাঁকে খেতেই হবে।

তবুও হারা চলবে না। হাকিমি কলকাঠি আছে হাতে।

"আয়েজান বিবির বোরখা পরানো আছে?" উঠোন পেরিয়ে নির্দিষ্ট ঘরের দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"ঘরের ভেতরে কে আর বোরখা পরে থাকে হুজুর?"

"তাহলে ঘরের সকলকে ঘর ছেড়ে যেতে বল।" হুকুমেরই সুর তাঁর কথায়।

চমকে ওঠে লোকটি। ঠিক এরকম হুকুম আশা করতে পারেনি সে।

"আমি চাইনা যে ওঁর হ'য়ে আর কেউ কথা বলে।" কথাটি যদি বুঝতে কষ্ট হয় তাই আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন তিনি, "যা বলবার উনি ঘরের ভেতর থেকে বলবেন, আমি বাইরে থেকে শুনব।"

এ কথার পর তখুনি কোন কথা বলতে পারে না লোকটা। একটু চিন্তিতই হ'য়ে পড়ে সে। এই সুযোগটুকুই চাইছিলেন মহিমবাবু। মানুষকে একবার চিন্তার প্যাঁচের ভেতরে টেনে এনে ফেলতে পারলেই সে দুর্বল হ'য়ে যায়। এই একই মনস্তত্ত্বের ওপরে নির্ভর ক'রে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব ক'রে চলেছে বৃটিশ সরকার। শুধু চিন্তা আর চিন্তা। একক। দানা বাঁধবার সুযোগ দিতে গররাজী। যখনই এক হয়েছে দশমাথা অমনি নতুন সমস্যার সৃষ্টি ক'রে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে সেই জমাটবদ্ধ চিন্তা ধারাকে। তারপর একের পর এক সমস্যার বীচিমালা সৃষ্টি

ক'রে মাথা তুলবার ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নিয়েছে তাদের। মহিমবাবুও আর এক ধাক্কা দেন চিন্তিত মানুষটিকে।

"যাও, গিয়ে ঘর থেকে বার ক'রে দাও সকলকে।"

"তা কি ক'রে হয় হুজুর?" বেঁকে দাঁড়ায় লোকটি এবারে, "বুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন কাউকে দলিলটা পড়ে যেতে হবেত'?"

"বেশ, তুমি থাকবে ঘরে, আর কেউ নয়।"

অনুমতি পেয়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠে লোকটি। ছুটে গিয়ে ঘর থেকে সকলকে বের ক'রে দেয়। হাঁক ডাক ক'রে একটা টুল আনিয়ে বসতে দেয় হুজুরকে। ঘরের বাইরে, ঠিক দরজার পাশেই। তারপর আরম্ভ হয় দলিল পাঠ। সারমর্ম হচ্ছে এই যে বৃদ্ধা আয়েজানবিবি মৃত মুকসেদ আলির বিধবা তার ডাঃমণ্ড হারবারবস্থিত অমুক মৌজার অত নম্বর ম্যাপের ১৭৫নং প্লটের ৩ একর ২৭ শতাংশ ধানি জমি এবং ঐ ম্যাপের ২৪১নং দাগের ১বিঘা ১৬৫ শতাংশ বসতবাটির জমি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব আব্দুল কাদেরকে দান করিয়া এই দানপত্র লিখিয়া দিতেছে।

মোদ্দা অংশটি শোনা হ'য়ে যেতেই প্রশ্ন করেন মহিমবাবু, "আপনি স্বেচ্ছায় এই জমি দান করছেন?"

"হ্যাঁ।" ঘরের ভেতর থেকে উত্তর ভেসে আসে।

"কাকে দান করছেন এবং কেন দান করছেন?"

"আব্দুল কাদেরকে। আমার আর কেউ নেই। এই ভাইবেটাই সব। তাই আমার যা কিছু—"

"ও," বলে ফিরে তাকান তিনি আব্দুল কাদেরের দিকে। দলিলখানা হাতে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

"আচ্ছা এই টিপসই কি আপনার?" দলিলখানা হাতে নেন মহিমবাবু।

"হ্যাঁ।"

"কতটা জমি দান করছেন?"

একথার কোনও উত্তর আসেনা ঘরের ভেতর থেকে। না আসুক উত্তর। তাতে কিছু আসবে যাবে না।

"সাক্ষী থাকবে কারা?" আব্দুল কাদেরকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

"ডেকে আনছি হুজুর।"

"দাঁড়াও। এটাতেও একটা টিপসই করিয়ে দাও।" সঙ্গে আনা রেজিষ্ট্রীখানা এগিয়ে ধরেন তিনি, "এই জায়গায়।"

রেজেষ্ট্রীতেও টিপসই হয়ে যায়। সাক্ষীও আসে। দিয়ে যায় তাদের টিপসই। লোকটি অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লার কাছে হুজুরের ভালর জন্যে দোয়া মেঙে রাহাখরচের জন্যে কিছু সেলামী দিতে যায়। নেন না মহিমবাবু। যা দেবার সরকারের ঘরেই দেওয়া হ'য়েছে। তার প্রাপ্য অংশ সেখান থেকেই মিলবে। অগত্যা কয়টি ডাব সঙ্গে দিয়ে দেয় লোকটি। নইলে হুজুরের বড় কষ্ট হবে রাস্তায়।

সেই দানপত্রের পর একটা মাসও পার হলনা শহীদান বিবির চাচা আর আব্দুল কাদের মাথা ফাটাফাটি ক'রে দাড়াল এসে জজকোর্টে। বিশদ ভাবে উপলব্ধি করলেন মহিমবাবু হায়েজান বিবির দানপত্রের মর্ম। আরও যা শুনলেন তা কম চমকপ্রদ নয়। এই প্রথম তালাক নয় শহীদান বিবির। এর পূর্বে মৌলবী কাজীর সাহায্য নিয়েছে নাকি তার চাচা। এই নাকি তার ব্যবসা। রূপসী ভাতিজীর বিয়ে দিয়ে যতটা পারে শুষে নেয় বরপক্ষের রক্ত। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই তাকে নিয়ে এসে তালাক দেওয়ায়। দুর্বলতা কিছু ছিল নিশ্চয়ই মেয়েটির। কিন্তু কি সে দুর্বলতা তা আর জানতে পারেননি মহিমবাবু। তবে কানা ঘুষোয় শুনেছিলেন ওর চাচা নাকি

আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়ে ওকে দিয়ে এই কাজ করাতো। প্রলুব্ধ মন। হিসাব ছিলনা যে বারে বারে ধান খেতে গেলে একদিন ফাঁদে পড়তেই হয় ঘুঘুকে। তৃতীয়বারের পাল্লায় পড়ে গেল চাচা আব্দুল কাদেরের হাতে। 'তালাক' রেজিস্ট্রী করবার ক'দিনের ভেতরেই সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে আটঘাট বেঁধে কাজে নেমে পড়ল কাদের। কেবা আয়েজান বিবি আর কেই বা করে দানপত্র। তবুও দানপত্র হল, রেজিষ্ট্রীও হ'ল। চাচার উৎপাতের কড়ি এখন চিৎপাতে যেতে বসেছে। টাকার অভাব নেই কাদেরের। হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ে যাবে সে বিনা আয়াসেই। আর সেই ধাক্কা সামলাতে কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি উঠবে শহীদানের চাচার।

ঘটনা শুনে হতভম্ব হয়ে যান মহিমবাবু। অত কাণ্ড ক'রে তাঁকে নিয়ে গিয়ে এক জাল দলিল রেজিষ্ট্রী করাল কাদের, অথচ তিনি তার বিন্দু বিসর্গ কিছু বুঝতেই পারলেন না?

আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলেন মহিমবাবু। তখন পর্যন্ত তিনি ধারণা করতে পারেননি যে তাঁকে আশ্চর্যের শেষ সীমায় ঠেলে দেবার মত আরও কিছু থাকতে পারে এর ভেতরে।

পূজোর আগে বর্ষা বুঝি তার শেষ জানান দিয়ে যাচ্ছিল। যত না বৃষ্টি তার চাইতে বেশী বাতাস। শ্রাবণ ভাদ্রের ধারার দিকের ঠিক নেই। যৌবনে যার ক্ষুধা মেটেনি উপান্ত দশায় সেই মেয়েরই মত আন্‌চান্‌ করা স্বভাব। সামান্য দুর্বলতার ছিদ্র পেলেই ঝাপটা মেরে যেতে কসুর করেনা। দরজা জানালা মোক্ষম ক'রে আঁটা। ভেতরে লণ্ঠনের আলোয় অনুরূপবাবুর নাট্যরূপ দেওয়া কৃষ্ণকান্তের উইলখানা পড়ছিলেন মহিমবাবু। মহলা চলেছে নাটকটির। এবারের পূজোয় মিত্তিরবাবুদের নাট-মণ্ডপে হওয়ার কথা আছে। খরচ সমস্ত তাঁদেরই। অর্থাৎ নাটকের ইতিহাসে তাঁরা স্বাক্ষর রেখে যেতে চান যে তাঁদেরই চেষ্টায় প্রথম নাটক অভিনীত হয় এই ডায়মণ্ড হারবারে। যদিও

এর কোনটিই সত্য নয়। এই প্রথম নাটক নয় এতদঞ্চলে। এর পূর্বে আরও দুইটি নাটক (সিন অভাবে পর্দা টাঙ্গিয়ে) হ'য়ে গিয়েছে এখানে। আর চেষ্টাটা সম্পূর্ণভাবেই ছিল অনুরূপবাবুর। এবারেও তাঁরই চেষ্টা। কিন্তু সে কথা জানছে কে? মিত্তিরবাবুরা তা জানিয়ে দেবেন। কলকাতার পত্রিকায় তুলে দেবেন তাঁরা তাঁদের কীর্ত্তির কথা।

তা করুন তাঁরা, তাতে মহিমবাবুর কোনও আপত্তি নেই। শুধু যদি অনুরূপবাবু একটু দয়া করতেন তাঁকে। কিন্তু সে দয়ার লক্ষণ কিঞ্চিৎমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু তাঁরই প্ররোচনায় মিত্তির-বাবুদের অন্দর এসে হানা দিয়েছে তাঁর অন্দরে। আর পেয়ে বসেছেন লক্ষ্মীদেবী।

"সত্যি, মেয়ে সাজলে তোমাকে যা মানাবে—" সস্নেহে স্বামীর চিবুকটি তুলে ধরেন তিনি।

"হুঁ, ভারি আনন্দ, না?" কপট গাম্ভীর্য মহিমবাবুর, "আর সত্যি সত্যিই যদি মেয়ে হ'য়ে যাই?"

"আমি অমনি তুমি হ'য়ে যাব," উত্তর মুখের আগায়, "সত্যি, সাজনা গো। আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"সর, পড়তে দাও বইখানা।" স্ত্রীর বৃষ্টিঝরা নিশীথের ভাল-লাগা অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিছানার ধারটিতে সরে আসেন মহিমবাবু।

হাকিমের মেজাজের ধার ধারেন না হাকিমের স্ত্রী। তিনি সরে আসেন সঙ্গে সঙ্গেই, স্টীমারের পাশের জালিবোটের মত।

"পড়তে দেবে না?"

"কি রকম বৃষ্টি হচ্ছে দেখেছ?"

"শুনছি।"

"কি?"

ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ ছাপিয়ে একটা খট্‌খট্‌ শব্দ ওঠে সদর দরজায়।

"দরজায় খট্‌ খট্‌ শব্দ। সরত' দেখি, কেএল এই বৃষ্টির ভেতরে।"

উঠে লণ্ঠন আর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে যান মহিমবাবু। মনের ভেতরে এক চিন্তা—কে আসতে পারে এই অসময়ে? কারও কোনও বিপদ হয়নিত'?

অনুরূপবাবু? না, আজইত' গল্প গুজব ক'রে গেলেন। বেশ সুস্থ মানুষ। জজসাহেব? না, তিনিও ত' আজ এজলাসে বসেছেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রী একটু অসুস্থ বটে। বর্ষার জ্বর। বেড়েও যেতে পারে। হয়ত' সেখান থেকেই তলব এসেছে। ভোগাবে দেখছি এই বৃষ্টি বাদলার রাত্রে। মাথায় চিন্তার রাশি নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ঠায় দাঁড়িয়ে যান তিনি। এ দুই মূর্ত্তিকে এই অপার্থিব সময়ে এখানে দেখবেন বলে আশাও করতে পারেন নি তিনি। আব্দুল কাদের আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। গঙ্গা থেকে ডুব দিয়ে এসেছে যেন। বোরখা নেই মেয়েটির। কপালের ওপরে এসে পড়া কয়েক গুচ্ছ চুল বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জলের ফোঁটা পড়ছে তার মুখের ওপরে। দেহের সঙ্গে লেপ্টে যাওয়া শাড়িখানার দিকে তাকান যায় না। উদ্ধত যৌবন যেন তার সমস্ত উন্মুখতা নিয়ে তাকিয়ে। একহাতে চেপে ধরেছে কাদেরের হাত আর একহাতে অনবরত মুখ চোখের ওপর থেকে জল সাপটে ফেলছে সে।

মহিমবাবু কিছু বলবার পূর্বেই বলে ওঠে কাদের, "একটা আর্জি ছিল হুজুর!"

মনে পড়ে আয়েজানবিবির দলিল রেজিস্ট্রার ঘটনা। সেও কাদের, এও কাদের। অথচ এ যেন নতুন মূর্ত্তি তার। এর ভেতরে প্রকৃত করুণাপ্রার্থীটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া কৌতুহলও আছে। এমন কি ঘটনা আবার ঘটল যা এই দুইটি নরনারীকে এমন ক'রে এনে দাঁড় করিয়েছে তার দরজায়?

"এস, আগে ঘরে এসে বস। তারপর কথা হবে।" লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে চলেন তিনি। পিছনে ওরা দু'জন। বাইরের ঘরের বারান্দায় উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, "কাপড়টা একটু নিঙড়ে নাও, নইলে বসতে অসুবিধে হবে।" বলেই ঘরের তালা খুলে লণ্ঠন নিয়ে ভেতরে ঢুকে যান তিনি। দু'খানা কাঠের চেয়ার টেনে দেন দরজার কাছাকাছি। তারপর আর একটিতে নিজে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁর অতিথিদের জন্যে।

একটু পরেই ঘরে এসে ঢোকে তারা। ইতিমধ্যেই যতটা পারে জল ঝরিয়ে নিয়েছে তাদের জামা কাপড়ের। বৃষ্টির আক্রমণে স্পষ্ট বে-আব্রু ভাব আর নেই মেয়েটির। এই অত্যল্প সময়ের ভেতরেই নতুন ক'রে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে সে। প্রথম দর্শনে আগুনের ফুলকির মত যে রূপ এসে বিঁধেছিল মহিমবাবুর চোখে, এখন তারই চেহারা হ'য়েছে বর্ষা ধোয়া যূঁইএর মত স্নিগ্ধ।

"বস তোমরা।"

বসতে রাজী নয় তারা। মাথা নীচু করে নীরবে জানায় তাদের অক্ষমতা। অপরাধ তারা দু'জনেই করেছে এই মানুষটির কাছে; আবার দু'জনেই তারা এসেছে এঁরই দরবারে জীবনের বিরাট এক সমস্যার সমাধানের আশায়। এমতাবস্থায় ওঁরই সামনে চেয়ারে বসে ওঁকে অপমান করবার মত পাপ আর তারা করতে চায়না।

"কিন্তু না বসলেত' কোন কথাই তোমাদের শোনা হবে না। এতে যে অপমান করা হয় গৃহস্থের," মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান মহিমবাবু। পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে পড়েছে মেয়েটি। ভেঙ্গে পড়েছে তার শক্তির বাঁধ। কান্না জড়ান গলায় সে শুধু বলে চলেছে, "আমার সেই তালাক-নামা ফিরিয়ে দিন হুজুর।" এতক্ষণে বুঝতে পারেন তিনি এই মেয়েটিই শহীদানবিবি। কিন্তু যে স্বামীর লাঞ্ছনার অজুহাত দিয়ে

তালাকনামা রেজিষ্ট্রী করিয়েছিল, এ সে নয়। এ ভালবাসায় ভরা-বুক একটি নারী। জীবনে যে বিরাট ভুল সে করেছিল তারই সংশোধন আশায় ছুটে এসেছে সমস্ত দুর্যোগ উপেক্ষা করে হাকিমের কাছে তার আর্জি পেশ করতে।

"ওঠ, আগে উঠে বস দেখি। শুনি সব কথা, তাবপর চিন্তা করে দেখি কি করা যায়।"

ধীরে ধীরে উঠে বসে শহীদান। চেয়ারে আর বসে না। বসে মেজের ওপরেই। কাদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। বাইরে তখনও বৃষ্টির জের চলেছে। বুকভরা কান্না আকাশের আজ বাঁধ ভেঙ্গে নেমেছে ঐ শহীদানেরই মত।

"আমি জন্ম-পাপী হুজুর। আমার পাপের অন্ত নেই," ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলে শহীদান, "আমার সে পাপের কথা আজ জানে মাত্র দু'জন লোক। একজন আমার চাচা—"

"আর একজন আমি।" দু'পা এগিয়ে এসে শহীদানের পাশেই বসে পড়ে কাদের। যৌবন যেন দু'হাতে ভরে দিয়েছে তার সম্পদ এই মানুষটির দেহে। লক্ষ্য করেছেন মহিমবাবু, এই মানুষটির চলা, বলা সবকিছুর ভেতরেই একটা দৃপ্তভাব। আগে বুঝতে পারেননি, আজ বোঝেন এটা ওর ঔদ্ধত্য নয়, ওর স্বভাব।

শহীদানের পাশে বসে পড়তে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসেন মহিমবাবু। অবনত মস্তক শহীদান লক্ষ্য করেনি তা। কিন্তু এড়ায়নি কাদেরের চোখ।

"হাসছেন হুজুর?" ক্ষুব্ধ প্রশ্ন কাদেরের।

"বলব," কোমল স্বর মহিমবাবুর, "আগে তোমাদের বলা শেষ হ'ক। তার আগে একটা কাজ করবে? শুক্‌নো ধুতি শাড়ি এনে দেব, পরে নেবে? নইলে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে।" সহৃদয়তার পরশে যদি অপর দুইটি মনের অভিমান মুছে দিতে পারেন সেই চেষ্টাই করেন তিনি।

"না বাবা," একটুখানি মুখ তুলেই আবার দৃষ্টি নামিয়ে নেয় শহীদান, "কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। আজ এ কষ্ট আমাকে সহ্য করতেই হবে। ওকে বরঞ্চ একখানা ধুতি—"

"শুনবেন না হুজুর," বাধা দিয়ে বলে ওঠে কাদের, "ভীষণ স্বার্থপর ও। শুধু নিজের কথাটাই চিন্তা করে।"

কথা শুনে হেসে ফেলেন মহিমবাবু। শুধু বুঝতে পারেন না এতবড় স্বার্থপর শহীদান কেন তালাক দিল কাদেরকে। যেটুকু পরিচয় ওদের আজ এইখানে বসে তিনি পেয়েছেন তার ভেতরে আর কোন কিছুইত' তিনি দেখতে পাননা এক বুকঢালা ভালবাসা ছাড়া। তবে?

সেই 'তবে'র উত্তরও তিনি পান সেই রাত্রেই। জানায় কাদের। পড়ে রইল কাপড়ের প্রশ্ন। এমন কিছু মুখ্য বস্তু নয় সেটা। মুখ্য যা, যার জন্যে উপেক্ষা করা এই দুর্যোগময়ী রাত্রিটিকে, তাই বলে যেতে থাকে কাদের। আর কোথাও যদি সে ভুল করে বা ইচ্ছাক্রমেই চেপে যেতে চায় কোনও কিছু, অমনি মাথা তুলে উজ্জ্বল দুটি চোখের তারায় শাসন করে শহীদান। বলে, "বাবার কাছে একটি কথাও লুকোবে না।"

সে শাসন মেনে নেয় তার তালাক দেওয়া শওহর। বলতে থাকে—

আব্দুর রহমান আসলে ডায়মণ্ড হারবারের মানুষ হ'লেও পরবর্তী জীবনের প্রথমে সে কাকদ্বীপ এবং পরে লক্ষ্মীকান্তপুরের দিকে গিয়ে বাস করেছিল। দুর্দান্ত প্রকৃতির এই মানুষটির অন্তর ছিল শিশুর মতই অভিমানে ভরা। প্রকৃতির সে ছিল যেন এক নতুন খেয়ালে গড়া মানুষ। লাঙল কাঁধে নিয়ে দরাজ গলায় মেঠো সুরের টান দিতে দিতে এগিয়ে যেত মাঠের দিকে। আর শুধু 'লড়ি'র সুড়সুড়ি দিয়ে দিক ঠিক করে দিত তার বলদ দুইটির। মারত না কখনও। কেন মারে না জিজ্ঞাসা করলেই খেঁকিয়ে উঠত,

"বেঁধে মারতে বড় আরাম, না? বাড়িগাছের যদি অত জোর, যাও না সোঁদরবনে।" এ হেন আব্দুরই আবার দৈত্যের মত ভীষণ আকার ধারণ করত যদি কেউ তার জমির এক ইঞ্চি জায়গাও লাঙলের ফলার দাগ টেনে ঢুকিয়ে নিতে চেষ্টা করত আপন জমির সীমানার ভেতরে। সহজ সরলভাবে জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ারই সে ছিল প্রয়াসী। চোরাগলির রাস্তায় একবার উঁকি মেরেও দেখেনি কি স্বাদ সেখানকার।

"দেখেছিল, একবার।" মাথা তোলে শহীদান।

"বলছি, দাঁড়াও না।" তার কথার জবাব দিয়ে আবার পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে যায় কাদের, "সেই আব্দুর রহমানই একদিন তার বউকে তালাক দিয়ে চিরদিনের জন্যে ঘরছাড়া হ'য়ে গেল।"

"কারণটা বলতে আপত্তি আছে?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"আপত্তি?" সোজা প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকায় কাদের। না তাকিয়েও অনুভব করেন মহিমবাবু, শহীদান একদৃষ্টে কাদেরের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে তার উত্তরের।

"না হুজুর," মুখ নামিয়ে নেয় কাদের, "আজ সব কথা আপনাকে বলব বলেইত' এসেছি। অন্তরের ভরসা যেখানে সেখানে সব দরজাই যে খোলা। লুকোবার জায়গা কোথায় হুজুর?"

আবার বলতে আরম্ভ করে কাদের, "আয়েজান বিবির ব্যবহারটা বড়ই আঘাত দিত আব্দুর রহমানকে।"

"আয়েজানবিবি!" আরম্ভের মুখেই বাধা দেন মহিমবাবু।

"দরজাটা লাগিয়ে দি' হুজুর, বড় বাতাস।" বলে উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয় কাদের। ফিরে এসে বসতে বসতে বলে, "হ্যাঁ হুজুর, সেই আয়েজানবিবি। বললেই বুঝতে পারবেন সব।"

বলতে থাকে কাদের—

আব্দুর রহমানের ছোট ভাই আব্দুল জব্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল আয়েজানবিবির। রহমানের সাধারণ শালীনতা বোধে সেটা বড় বাধত। আরও একটা জিনিষ ধাক্কা দিত তার বুকে। সেটা হচ্ছে সর্ববিষয়েই জব্বরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল তার স্ত্রীর। এর নিগূঢ় কারণটি জানবার কোন দিনই চেষ্টা করেনি সে। ছোট ভাই জব্বরকে সে সত্যিই ভালবাসত। কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে পাছে ভাইকে অপমান ক'রে বসে এই ছিল তার ভয়। একটা নেশা ছিল তার—মাছ ধরা। যখনই মন খারাপ হ'ত, তেকাঠির জাল কাঁধে ফেলে সোজা চলে যেত গঙ্গার ধারে। উঠে বসত জেলেদের নৌকোয়। 'না' বলত না জেলেরা। চিনত তারা দরাজ দিল আব্দুরকে। দিনের শেষে নৌকো থেকে নেমে হিসেব মত অর্দ্ধেক মাছ দিয়ে আসত জেলেকে। এ হিসেব তারই সৃষ্টি। জেলেরা বলেনি কোনদিন। আব্দুরকে তারা বুকের বল হিসেবেই সঙ্গে নিত। মাছ ধরা নিয়ে গঙ্গার বুকে অনেক রক্তপাত হ'য়ে গিয়েছে। হ'তে পারে আরও অনেক। ঐ মানুষটি সঙ্গে থাকলে নিজেদের মাথা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত তারা।

সেই রকমই একদিন কয়েক সের মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে সে। সদর থেকে প্রায় মাইল খানেকের পথ। তাছাড়া নেমেছেও সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে। পেটে টান। গলা শুকিয়ে মাঝ পথেই তার দরাজ গলার গান গিয়েছে থেমে। হন্ হন্ ক'রে প্রায় ছুটে এসেছে বাড়ি। আগে চাই একটু পানি। তারপর খাদ্য। কিন্তু বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে যায়। অন্ধকার গৃহস্থের ঘর। জালটা উঠোনের ওপরেই নামিয়ে রেখে নিজের ঘরের বারান্দায় গিয়ে ওঠে সে। দরজা খোলা। কেউ নেই ঘরে। কি ব্যাপার? এরা কোথাও বেড়াতে গিয়েছে নাকি? আজ কি কোথাও কবি গান টান আছে? একটু দূরেই নুরুলদের বাড়ি খোঁজ

নিতে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় আব্দুর : জব্বরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে আয়েজান।

সেই রাত্রেই 'তিন তালাকে'র ব্যবস্থা ক'রে ডায়মণ্ড হারবারের এ তল্লাট ত্যাগ ক'রে আব্দুর।

থেমে যায় কাদের। নিস্তব্ধ গৃহকোণ, বৃষ্টিঝরা রাতের পল্লীও নীরব। কান্না থেমেছে আকাশের, থামেনি ফোঁপানি। ঝির ঝির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে তার। যা বলল এতক্ষণ কাদের তা ভূমিকা। আসল ঘটনায় প্রবেশ করবার কথা বলতে যাবেন মহিমবাবু এমন সময় সেই নিস্তব্ধতা খান্ খান্ ক'রে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে টেন্নু, "যাবনি যাও। এঃ, একজন ভোঁস ভোঁস ক'রে নাক ডাকবেন এখেনে আর একজন বারাণ্ডায় বসে গল্প শুনবেন আর আমি এ্যাখোন উনুন ধইরে চা বানুব রাজপুত্তুর রাজকন্যের জন্যে। পারবুনি আমি। কাজ করবুনি এখেনে।"

টেন্নুর কথা শুনে ঘরের ভেতরে হেসে ফেলেন মহিমবাবু, বলেন,—"বেচারীকে বোধহয় ঘুম থেকে টেনে তুলেছে। ছেলেটি এমনিতে খুব ভাল, কাজ কর্ম খুব মন দিয়ে করে কিন্তু ঘুম থেকে কেউ ওকে টেনে তুললেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওর।"

ঘটনাটা ঘটেছিলও ঠিক তাই। দরজার বাইরে মোড়া পেতে বসে ঘরের ভেতরের ইতিহাস শুনছিলেন লক্ষ্মীদেবী। হঠাৎ খেয়াল হয় তাঁর, ওদের একটু চা দেওয়া উচিত। আর্দালী নাত্‌নীরামকে ডেকে বলেন, "দুজন অতিথি এসেছে। একটু চা বানিয়ে দিতে হবে। টেন্নুকে একবার ডেকে দাও না।"

সুযোগ পেলে নাত্‌নীরামও ছেড়ে দেয় না। টেন্নুকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মজা দেখতে তার ভারি আনন্দ। ওর লাগানিতে মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায় টেন্নু। ছুটে এসে জাপটে ধরে নাত্‌নীরামকে। আর সেও তার সবল দুটি বাহুর পেষণে পিষে ফেলবার উপক্রম করে তাকে। মেজাজ দেখাবে কি, বেচারীর তখন কণ্ঠাগত প্রাণ।

গিন্নীমার হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোটা উস্কে দিয়ে টেনুর কানের কাছে চলতে থাকে তার বিকট স্বরে রামায়ণ পাঠ। যদি কানে না ঢোকে তার স্বর তাই মাঝে মাঝে মুখটা টেনুর কানের কাছে নিয়ে যায় নাত্নীরাম। অস্বস্তিতে উস্খুস্ করতে করতে শেষে এক সময় লাফিয়ে উঠে বসে টেনু। চেঁচাতে থাকে, "কি, হ'য়েছে কি? চেঁচাচ্ছিস্ কেন হেঁড়ে গলায়? আমি ঘুমুবুনি?" বলে আবার শুতে যায় সে। হাত বাড়িয়ে বাধা দেয় নাত্নী, "গিন্নীমা কি বোলতেসেন—"

শোওয়া আর হয় না। "কি আবার বলবে" বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে আসে টেনু। অপেক্ষাতেই ছিলেন লক্ষ্মীদেবী। টেনু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বলেন কাদেরদের দু'জনের জন্যে চা তৈরী করতে। এমনিতেই ফোঁস মনসা, তার ওপরে ধূপের ধোঁয়া। ঘুম ভাঙ্গানতেই মেজাজ খারাপ, তার ওপরে চা তৈরী! পবিত্রাহি চেঁচাতে থাকে টেনু। সোজা জানিয়ে দেয় চা তৈরী করতে পারবে না সে। লক্ষ্মীদেবীও ছাড়বার পাত্রী নন। সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধের ব্যবস্থা করেন তিনি। ভুঁড়ি দুলিয়ে বাইরে এসে দাড়ায় নাত্নী। সুর ক'রে ডাকতে থাকে, "টেনুবাবু, এ টেনুবাবু—"

বিচিত্র সে সুর। এ সুরের আবিষ্কর্তা নাত্নীরাম নিজে। টেনুবাবুকে জ্বালাবার এ এক অভিনব পদ্ধতি। সেই অদ্ভুত সুরে পেটের নাড়িশুদ্ধ গুলিয়ে ওঠে হাসিতে। তাড়াতাড়ি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে যান লক্ষ্মীদেবী। আর এদিকে প্রাণপণে চেঁচাতে থাকে টেনু, "টেনুবাবু, টেনুবাবু—মুখপোড়া হনুমান, আমি বাবু হইচি? তোর বাবু আমি। আমার সব কাজ তুই ক'রে দিবি হতভাগা। টেনুবাবু! আমি হবনি টেনুবাবু, আমি করবুনি চা। এঃ, যে আমার দু'টাকা মাইনে—" বলেই জিবকেটে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে যায় টেনু। দু'টাকা মাইনের

দুর্বলতাকে সে প্রকাশ করতে চায় না কোথাও। নিজের দুর্বলতাকে নিজেই প্রকাশ করবার শাস্তিস্বরূপ ঘুঁটে ধরিয়ে চায়ের জলের ব্যবস্থা করতে থাকে।

"যাক্ মিটে গিয়েছে ওধারে। এবারে বল," বলে ওঠেন মহিমবাবু।

"সেই থেকেই কাকদ্বীপবাসী হয়ে গেল আব্দুর রহমান।" আব্দুরের জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ করে কাদের।

শক্ত-সিকিম চেহারা খানা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল জমিদারের সামনে। জমি চাই আর চাষ করবার উপযুক্ত জিনিষ চাই।

"আবার লুকোচ্ছ বাবার কাছে?" ধমকে ওঠে শহীদান, "না বাবা, বা-জান প্রথমে গিয়ে ওঠে এক হিন্দুবাড়ী। সেখানে কয়েকটা দিন থেকে একটা কাজের চেষ্টা করে। কিন্তু সে কি সহর নাকি যে হাজার রকম কাজের ধান্ধা আছে। বা জানেরও জোটেনা কোন কাজ। তখন বা-জান গিয়ে উপস্থিত হয় জমিদারের কাছারীতে। কপালগুণে জমিদারও ছিলেন সেখানে।" বলে যেতে থাকে শহীদান—

কাজ হয়ে গেল এক কথাতেই। আব্দুরের দশাসই চেহারা দেখেই হুকুম দিলেন জমিদার—যতটা জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে নিতে পারবে সে ততটাই হবে তার চাষের জমি। নজর দিতে হবে না, শুধু খাজনা দিলেই হবে। জীবন-স্বত্ব। অর্থাৎ যতকাল বাঁচবে সে ততকাল ভোগ করবে এই জমি। বিক্রী বন্ধক চলবে না। মারা গেলে জমি চলে যাবে জমিদারের খাস দখলে।

তাতেই রাজী আব্দুর। জমিদারের কাছ থেকেই পেল অস্ত্র-পাতি। কাজেও লেগে গেল। কিন্তু মনের ভেতরে একটা প্রশ্ন খচ্ খচ্ ক'রে বিঁধতে থাকে তার। জমি চাষের উপযুক্ত হলেই কেড়ে নেবেনাত' জমিদার? তবুও মনের কথা মনেই চেপে রেখে কাজ করতে থাকে সে। এ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই তার।

"...কের দিন নয় হুজুর," শহীদানের মুখ থেকে কাহিনী টেনে নে...দের, "আরও ২২।২৪ সাল আগের ঘটনা। কাকদ্বীপ বলতেই বোঝায় খুনের দেশ। কত মানুষ যে ভেসেছে গঙ্গার জলে আরে কতজন গিয়েছে মাটির নীচে, কে তার হিসেব রাখে। কাকদ্বীপের একটা চলতি কথাই ছিল তখন—টাকা যার, দারোগা তার।"

"চা—" দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে টেনু।

"নাও, চা-টুকু খেয়ে নাও তোমরা, শরীরটা একটু গরম হবে।"

গ্রাম্য চাষী। চা খাওয়া অভ্যাস নেই। দুজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে থাকে। অস্বীকার করে অপমান করবারও সাহস নেই হুজুরকে।

"নাও, নাও," তাড়া দেন মহিমবাবু, "ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাল লাগবে না।"

অগত্যা হাতে তুলে নিতে হয় কাপ। শহীদান তার কাপ নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই ধমকে ওঠেন মহিমবাবু, "বাবা বলেছ না?"

তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গেই স্থান কাল পাত্র ভুলে হেসে উঠে কাদের। সহজ সরল গ্রাম্য হাসি মাত্রার ধার ধারে না। হাসে আব তাকিয়ে দেখে লজ্জা-রাঙ্গা মুখখানি শহীদানের।

"আহা, আর হাসতে হবে না বেহায়ার মত।" কৃত্রিম কোপের ভেতরেও একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা শহীদানের ঠোঁটের কোণে, "বাবার সামনে অমন ক'রে হাসতে লজ্জা করে না?"

"ঠিক জব্দ হয়েছে হুজুর," হাসতে হাসতে বলে কাদের, "ও ভাবে, ও বড় চালাক আর সবাই বোকা। এখন দেখ কে বোকা।"

চায়ে অনভ্যস্ত ঠোঁট একটুতেই পুড়ে যেতে চায়। তবুও হুজুরের অনুরোধ অমান্য ক'রে তাঁর মনে আঘাত দেবার সাহসও নেই কারও। একটু একটু করে কাপ খালি ক'রতে বেশ কিছুটা

সময় নেয়। কাপ দুটি নিয়ে গিয়ে ধুয়ে রাখে শহীদান। তারপর এসে বসে নিজের জায়গায়।

"বাইরে কেউ নেই ?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"নাত'। খালি একটা মোড়া রয়েছে," উত্তর দেয় শহীদান।

"ও। আচ্ছা, বল তারপর।"

অনুমতি পেয়ে আরম্ভ করে কাদের—

এক একজন মানুষ আছে যার ভাগ্যে এমন কোনও কাজ জোটে না যার ওপরে ভর দিয়ে চলতে পারে সংসারটা। পাখির মত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে সর্বদা ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে আহার্য আহরণের চেষ্টায়। সেই অবস্থাই ছিল আব্দুরের প্রথম আশ্রয়-দাতা হিন্দুটির। নাম জানে না তার শহীদান। শুধু ঘটনাটাই যা শুনেছে। দু'চার বিঘে জমি যা ছিল তাব দানে চটকেব উদর পূর্তি হ'তে পারে, হাতির মুখে তা তৃণগাছ। তাই সে চরকির মত ঘুরে বেড়াত সমস্ত কাকদ্বীপ। ঘবেব সঙ্গে সম্বন্ধ একরকম ছিলনা বল্লেই চলে। এদিকে আগুনের মত জ্বালাময়ী রূপ নিয়ে ঘরে বসে রয়েছে এক যুবতী মেয়ে। তাকে যে পবেব ঘরে পার করবার ব্যবস্থা করতে হবে সে খেয়ালও নেই তার। খেয়াল হলেও চেষ্টা করবার মত যথেষ্ট সময় এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব চোখ বন্ধ ক'রে থাকতে বাধ্য করেছিল তাকে।

সেই মানুষটিকে একদিন যেতে হয়েছিল কাকদ্বীপের শেষ সীমানায়, যেখানে প্রিয় সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের অপার আনন্দে নেচে ফুলে উঠে আপন বক্ষ প্রসারিত করে দিয়েছে গঙ্গা, যতদূর পারা যায়। যেখানে পাড়ি দিতে শক্ত মাঝির বুকও একবার কেঁপে ওঠে। মাঈজীর নাম স্মরণ করে, গলুই এর মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে শক্ত-মুঠিতে হাল ধরেও যেখানে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না জলের ওপরে জীবন-কাটান বৃদ্ধ পোতবাহ। সেইখানেই যেতে হ'ল মানুষটিকে নায়েবের একখানা চিঠি হাতে নিয়ে। অবশ্য খোরাকি এবং দু'

দিনের রোজ অগ্রিমই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে। দিনের খোঁজে দিন কাটে যার, দু'দিনের অগ্রিম টাকা বড় সামান্য নয় তার কাছে। সন্দেশ-বাহক হ'য়ে উড়ে চলে সে ওখানকার সম্পন্ন গৃহস্থ জনাই মণ্ডলের বাড়ির দিকে। তারই নামে চিঠি।

পথ সৃষ্টি হ'য়েছে গরুর গাড়ীর চাকায় আর মানুষের পায়ে। তার দু'ধারে কোথাও ধানের ক্ষেত, কোথাও বা জঙ্গল। দিনের বেলাতেই একা সে পথে চলতে গা ছম্ ছম্ করে। রাত্রে সেই পথ পাড়ি দেবার কথা চিন্তাও করতে পারে না কেউ। সেও ফিরতে পারে না সেদিন। জনাই মণ্ডলের গৃহেই রাত্রি যাপন ক'রে পরদিন প্রভাতে মণ্ডলেরই দেওয়া একজোড়া ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে ফিরতে থাকে সে।

"বুঝতেই পারছেন হুজুর, কেন তাকে পাঠান হ'য়েছিল জনাই মণ্ডলের বাড়ি, যেখান থেকে সেদিন আর ফিরতে পারেনি সে। জোড়া ইলিশ দেখে বাড়ীর লোকজনের মুখ চোখের অবস্থা কি রকম হবে ভাবতে ভাবতে এসে বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে যায় সে। বিরাট এক ঝড় যেন বয়ে গিয়েছে বাড়িটার ওপর দিয়ে। তারই সঙ্গে লড়াই ক'রে নেতিয়ে পড়েছে সংসারের প্রতিটি মানুষ। ওকে দেখেই বুড়িমত একজন ডুকরে ওঠে—ওরে, আমার ফুল্কিকে কারা নিয়ে গেলরে—আর সঙ্গে সঙ্গেই আছড়ে পড়ল লোকটি উঠোনের ওপরে। একজনত' গিয়েছেই, আর একজনও বুঝি যায়। ছুটে আসে সকলে। জল আন, পাখা আন, একটা হৈ-চৈ পড়ে যায় বাড়িটার মধ্যে। কিন্তু কিছুরই দরকার হয় না। একটু পরে নিজেই ধীরে ধীরে উঠে বসে সে। চোখ দুটো হৃত-শাবক বাঘিনীর চোখের মত জ্বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—ভয় নেই, আমি এ ভাবে মরব না। আমার মরণ হবে ফাঁসীতে। সত্যি হ'য়েও ছিল তাই। যাই হ'ক, শুনুন—"

এগিয়ে চলে কাদের—

নায়েব নলিনীকান্ত মুখার্জীর আর কিছু থাক বা না থাক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভেদাভেদ জ্ঞানটা ছিল বড় তীক্ষ্ণ। ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয় জমিদারের উচ্ছিষ্ট আহারে রাজী নয়। তার হাত দিয়ে জমিদারের যে ভোগ যেত তা ব্রাহ্মণের প্রসাদ হ'য়েই যেত। তা-ই হ'য়ে গেল ফুল্‌কি। আগুন-জ্বালান রূপ তার অনেকদিন আগেই জ্বালিয়েছিল নলিনীকান্তের বুকখানিকে। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল নায়েব। কিন্তু যেদিন জমিদারের নজরের নিশানা পেল সেইদিনই যথোচিত ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে উঠল সে। আর সেই ব্যবস্থা মতই ফুল্‌কির বাবা গেল জনাই মণ্ডলের বাড়ি আব তার নিজ কন্যা হ'য়ে গেল মৃগয়া।

নায়েবের হাত থেকে জমিদারের হাতে। যৌবন বিকিকিনির বাজারে সে পসরার মূল্য বৃদ্ধি পেল। কিন্তু জমিদারের হাত থেকে যখন তা আবার নেমে আসে পারিষদের অধিকারে তখন সে সুলভ পণ্যের দাম পড়তির দিকে। ফুল্‌কির রূপ ছিল কিন্তু তার খেল্ ছিল না। ছলা-কলায়, বচনে আচরণে সামান্যকে অসামান্য ক'রে তুলে ধরবার কায়দা, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, কোন দিনই শেখেনি। তাই দাম যেমন উঠল্ তেমনি নামলও বড় দ্রুত।

জমিদার পরিত্যক্ত পদার্থে পারিষদ সন্তুষ্ট নয়। যেমন ভ্রমরের সাধ নেই বৃন্ত-চ্যুত ফুলে। ফুল্‌কির ভাগ্য নামতেই থাকে। কিন্তু কে নেবে একটি অপহৃতা যুবতীর দায়িত্ব? আইনের শেকল যে ছোটদের জন্যেই তৈরী হয়। তাই একদিন ভোরের অন্ধকারে জঙ্গলের দিকে যেতে তার অজ্ঞান দেহ দেখতে পেল আব্দুর একটি ঝোপের আড়ালে। অন্ধকারে চিনতে পারেনি তাকে। শুধু চিনতে পেরেছে একটি স্ত্রীলোক বলে। হতচকিত হয়েও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হারায় না সে। দুই সবল বাহুর ওপরে দেহটি তুলে নিয়ে ছুটতে থাকে চাষী-পল্লীর দিকে।

সদ্য ঘুমভাঙা পল্লীর শান্ত ভোরের বাতাস নাড়া খেয়ে যায় এই

আকস্মিক ঘটনায়। নাড়াখেয়ে ওঠে আব্দুরের মনও। ভোরের আলোয় মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে চম্‌কে ওঠে সে। এযে ফুল্‌কি! কি করা যায় এখন? ফুল্‌কির ভাগ্য বিপর্যয়ে মুষড়ে পড়ে আব্দুর।

এই পর্যন্ত এসেই থেমে যায় কাদের। তাকায় শহীদানের মুখের দিকে। ভারমুক্তির আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম এক ব্যথার ছাপ সে মুখে। যে কথা এতদিন ধরে তার বুকের ওপরে চেপে বসে দমবন্ধ করে নিয়ে আসছিল সেকথা আজ তার জীবনের বিশেষ তুইটি মানুষের কাছে বলতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে সে। স্বীকৃতি সে পাক আর না-ই পাক, তাতেও আর তুঃখ নেই তার। 'সুন্দর চেহারার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে পরম বিষ' একথা যে আর কেউ বলতে পারবে না তাতেই তার আনন্দ।

"বলনা, থামলে কেন?" তাগাদা দেয় শহীদান।

ওধারে বৃষ্টিব চাপ আরও কম। ঝরছে ঝির ঝির করে, মুখরার প্রথম বর্ষণের শেষে গোঙরাণির মত।

"জীবনে একবারই মাত্র একটু তুর্বল হয়ে পড়েছিল বা-জান।" আত্মপ্রকাশ করতেই যেখানে এসেছে সেখানে রেখে ঢেকে বলবার পক্ষপাতী নয় শহীদান। যে কথা এড়িয়ে গিয়েছিল কাদেব, সেই কথা থেকেই সে আরম্ভ করে এবার।

"বা-জান মাত্র কয়েকটি দিন ছিল ঐ হিন্দু বাড়িতে। তারই ভেতবে ঘটেছিল ঘটনাটি। বাড়িটাব পাশেই ছিল ছোট্ট একফালি বাগান। সেই বাগানেব ভেতরে একদিন কুড়ুল দিয়ে কাঠ ফাড়ছিল বা-জান। এমন সময় মেয়েটি আসে লঙ্কা গাছ থেকে লঙ্কা তুলতে। আপন মনেই এগিয়ে যাচ্ছিল সে। খেয়াল করেনি যে কয়েক হাত দূরেই একটা বিষাক্ত লতা মুখ জাগিয়ে রয়েছে।"

"লতাটি কি?" কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন না মহিমবাবু।

"রাত্তির করে নাম করতে নেই ওর।" উত্তর দেন শহীদান।

বুঝতে পারেন মহিমবাবু সাপের কথা বলছে ও। মেয়েদের সংস্কার, রাত্রে নাম করেনা সাপের।

"বুঝলাম, তারপর বল।"

"বা-জানের হঠাৎ চোখ পড়ে সেটার ওপরে।" আরম্ভ করে শহীদান, "এদিকে মেয়েটি এগিয়েই চলেছে। আর দু'পা এগুলেই সর্বনাশ। ঢলে পড়তে হবে সেখানেই। হিন্দুর মেয়ে, যুবতী, এতসব হিসেব করবার সময় নেই। চীৎকার করলে ওটা ছুটে এসে ছোবল মারতে পারে। একটা মানুষের এই বিপদ তাকে আর চুপ করে থাকতে দিলনা। কুড়ুল হাতে ছুটে গিয়ে একটানে তাকে সরিয়ে আনবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক বিরাট ছোবল এসে পড়ল তার দাড়িয়ে থাকবার জায়গাটিতে। এতক্ষণে তারও নজর পড়েছে সেদিকে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে শক্ত করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে বা-জানকে। ওদিকে আবার ফণা জাগিয়েছে জীবটা। মুস্কিলে পড়ে যায় বা-জান। মরণ সামনে নিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এক ঝট্‌কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে দু'হাতে কুড়ুল তুলে ধরে বা-জান। জানেনত, মুসলমান জাত ওদের বড় শত্রু। দেখা হ'লে আর কথা নেই। শেষ করে তবে নড়বে সেখানে থেকে। বা-জানও শেষ করে সেটাকে। দ্বিতীয় ছোবল দেবার অবসরও দেয়না। কুড়ুলের বাড়ি খেয়ে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ে দূরে। বা-জানও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে গিয়ে কয়েকটা কোপে টুকরে টুকরো করে ফেলে ওটাকে।"

এক নিশ্বাসে এই উত্তেজনাময় কাহিনী শেষ করে একটু হাঁফিয়েই গিয়েছিল শহীদান। দম নিয়ে আবার ধীরে ধীরে আরম্ভ করে—"বাঁচল বটে কিন্তু মাথাটা গুলিয়ে গেল মেয়েটির। হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের অঙ্গস্পর্শ করেছে। এরপর আর কি ক'রে নিজের সতীত্বের দাবী করে সে? মাথার ভেতরের চিন্তা তার প্রতিটি কাজের মধ্যে ধরা দেয়। রান্নাঘরে ঢুকতে চায়না,

প্রদীপ দেয়না তুলসী তলায়। কেমন যেন অস্পৃশ্য বোধ করে নিজেকে।

এদিকে বা-জানও কেমন যেন হ'য়ে গেল। শুধু ঘুরে ফিরে এমন একটি জায়গায় এসে দাঁড়ায় যেখান থেকে দেখা যায় তাকে। কোন জোর নেই, কোন চাওয়া নেই। শুধু দেখা। এই একটি-বারই বা-জান যেন হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। কিন্তু সেও সামান্য দু'একদিনের জন্যে। তারপরই সম্বিৎ ফিরে আসে তার। আর ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় জমিদারের কাছারিতে।"

কাদের বলতে পারেনি বা বলতে চায়নি যা, অতি ধীর স্পষ্ট গলায় সেই কাহিনীটুকু বলে থেমে গেল শহীদান। নিস্তব্ধ নিশীথে মানুষেব শেষ সাড়াটিও থামল। ওধারে বৃষ্টিও গিয়েছে থেমে। ঘরের ভেতরে বসে রয়েছে তিনটি নির্বাক প্রাণী। মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে বুঝি নাটকেব শেষ দৃশ্যের জন্যে। এমন সময় দরজার কাছে একটু শব্দ হ'তেই সজাগ হ'য়ে ওঠেন মহিমবাবু।

"কে?"

"আমি।" দবজার ওপাশ থেকে লক্ষ্মীদেবীর সাড়া পাওয়া যায়।

"বাহিরে কেন? ভেতরে এসে।"

"এইত বেশ—"

"না, না, বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। ঘরে এস।'

অগত্যা দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন লক্ষ্মীদেবী। পাশ দিয়ে যেতে হাত বাড়িয়ে প্রণাম কবে শহীদান।

"ওকি?" চম্‌কে ওঠেন তিনি।

"প্রণাম করলাম মাকে।"

"তাহলে আশীর্বাদও নাও," বলে তার মাথায় হাত রেখে বলেন তিনি, "স্বামীর ভালবাসা কোনদিন যেন হারাতে না হয়।"

নির্বাক মহিমবাবু. এ যেন এক নাটকের অঙ্গীভূত আর একটি নাটক প্রত্যক্ষ করছেন তিনি। তাকিয়ে দেখেন নায়িকার

মুখের দিকে। সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীর বুকে মেঘের ছায়া। তবে? মূল সংলাপে কোথাও কি ফাঁক থেকে গেল? হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে শহীদান।

"কি হল? হঠাৎ কেঁদে উঠলে কেন অমন ক'রে?" লক্ষ্মীদেবী বসতে গিয়েও বসতে পারেন না। কান্নার বাধা পড়ে।

"আমার মরণ বাঁচন এখন বাবার হাতে," কাঁদতে কাঁদতে বলে সে।

"তোমার হাতে আবার কি?" কথাটি ঠিক বুঝতে না পেরে স্বামীকে প্রশ্ন করেন লক্ষ্মীদেবী।

"তালাক দিয়েছিল ওর স্বামীকে।" মহিমবাবুর উত্তরে হাকিমী নির্বিকারতা।

"মরণ আর কি! এমন কাজও মানুষে করে?" বসে পড়েন লক্ষ্মীদেবী।

"তাইতো সেই তালাকনামা নাকচ করতে ছুটে এসেছি বাবার কাছে।"

"আচ্ছা, সে যা হয় চিন্তা করা যাবে। এখন শেষ কর দেখি ঘটনাটা। রাতও বেড়েছে অনেক," তাগাদা দেন মহিমবাবু।

"হ্যাঁ। তারপর—' বলে আরম্ভ করে কাদের।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হ'য়ে যায় আব্দুর রহমান। যারা এর এই অবস্থার জন্য দায়ী তাদের হাতের কাছে পেলে খুন করতেও বোধহয় দ্বিধা করত না সে। আর বেশ জোর গলাতেই এ কথা শুনিয়েও দেয়—যদি কোনদিন সেই জানোয়ারদের খোঁজ পায় তাহলে এর শোধ তুলবে সে বেশ শক্ত হাতেই। এইখানেই ভুল করেছিল সে। একবার ভেবেও দেখেনি যে গোপন খবর সরবরাহকারী না থাকলে জমিদারী চালান যায় না।

দু'তিন দিন পরের ঘটনা। আব্দুর তখন তার বন কাটবার

কাজে ব্যস্ত। আব কয়েকটা দিন খাটতে পাবলেই একবিঘে জমি পুবো তৈবী হয়ে যাবে তাব। তখন চাষেব সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমিও বাড়বে ধীরে ধীরে। যদি কোনবকমে বিঘে দশেক জমি তৈরী ক'রে ফেলতে পারে সে—হিসেব কবতে থাকে মনে মনে; আব দুজন লোক লাগাতে পাবলে কাজটা এগুতো তাড়াতাড়ি। দুজনেব বোজ দু' আনা ক'রে চাব আনা আব একবেলা খোরাকী—উ: অনেক খবচ। মনে হিসেব, হাতে কুড়ুলেব কাজ। জানতেও পাবেনি কখন জমিদারেব পাইকেব সঙ্গে দাবোগাবাবুও এসে হাজিব হয়েছেন তাব খোঁজে। একটা জোব কুড়ুলেব কোপ মাবতে গিয়ে চমকে ওঠে সে। ওটা আটকে গেল কিসে? ফিবে তাকাতেই একটা সজোর চপেটাঘাত এসে পড়ে তাব গণ্ডদেশে, আর তাব সঙ্গে দাবোগাবাবুব হুঙ্কাবধ্বনি। যে আগুন জ্বলে উঠেছিল মাথায় দাবোগাবাবুকে দেখে তা আব প্রকাশ পেতে পাবে না। একটু ভয়েই [illegible] পড়ে সে। যে জঙ্গল পবিষ্কাব করছে সে, সেটা জমিদাবেব। তাদেব কথায় [illegible] বন্দোবস্ত। কোন লেখাপড়া নেই। তাই কি জবব দখলেব দায়ে ধবতে এসেছে তাকে [illegible]। একটি চপেটাঘাত আসে দাবোগাসাহেবেব তবফ থেকে। তাব পবই হুকুম, "চল্ থানা।" যেতেই হবে। বাজা [illegible]। [illegible] দাবোগাই বাজা। তাব হুকুমেব উপর কথা চলে না।

কথা চালাবাব মত অবস্থাও ছিলন আব্দুবেব। ঘটনাব চমৎকাবিত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল মুখেব ভাষাকে। কাছাবি বাড়িব সামনেই বসেছে বিচাবসভা। স-পারিষদ জমিদাববাবু উপস্থিত। নায়েব নলিনীবাবু একপাশে দাড়িয়ে। আবও আছে জমিদাবেব পাইক, করুণা লোভী চাষী আব উৎসুক জনতা। বুঝতে পাবে আব্দুব, তাবই জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে আজ। কিন্তু

কেন? কি তার অপরাধ? প্রশ্ন জাগে মনে। জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু বের হয় না মুখ ফুটে। শেষ দেখবার জন্যে মনে মনে তৈরী ক'রে নেয় নিজেকে। তখনও জানতনা সে যে বিস্ময়ের একটি বিরাট ধাক্কা অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

জনতার ব্যূহ ভেদ ক'রে তাকে নিয়ে গিয়ে ভেতরে ঠেলে দিতে ছিট্‌কে ক'পা এগিয়ে গিয়েই প্রস্তরিভূত হ'য়ে যায় যেন সে। ছু'হাতে মুখ ঢেকে ফুল্‌কি বসে রয়েছে বিচার সভার ভেতরে আসামীদের জন্যে সৃষ্ট উন্মুক্ত কাঠগড়ায়। সন্দিহান হ'য়ে ওঠে আব্দুর। তাহ'লে কি যে দোষে ছুষ্ট নয় সে, সেই পাপের বোঝা তারই স্কন্ধে চাপাবার ষড়যন্ত্র এটা! মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আব্দুর রহমানের ভেতরের সেই ছুর্দান্ত মানুষটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয় চক্রাকারে দণ্ডায়মান তার শুভানুধ্যায়ীদের। তারপরই বিকট এক 'আ-আ' চীৎকারে সকলকে হতচকিত ক'রে লাফ দেয় একজন পাইককে লক্ষ্য করে। উদ্দেশ্য তার হাত থেকে লাঠিখানা কেড়ে নেওয়া। কিন্তু যেতে আর হ'লনা তাকে। এর জন্যে প্রস্তুতই ছিল পাইকের দল। পার্শ্ববর্ত্তী একজনের তেলে জলে পাকান লাঠি সশব্দে এসে পড়ে তার মাথার ওপরে। আর সেইখানেই ছু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ে সে। ছু'চোখের আলো লেপেপুঁছে একাকার ক'রে সেখানে টেনে দিয়েছে এক নিকষ কালোর পর্দা। শুধু একবারের জন্যে সে শুনতে পায় মেয়েলি গলায় কে যেন তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে উঠল তার আঘাত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে।

তমিস্রার প্রকটতা ধীরে ধীরে কেটে যেতে দেখে ক'জন পাইক এসে চেপে ধরেছে তাকে। বিশ্বাস নেই এই আহত সিংহকে। হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে তাকে দাঁড় করায় যেখানে জমিদারবাবু আর দারোগাসাহেব বিচারাসনে আসীন হ'য়ে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের আসামীর জন্যে।

দারোগাসাহেবের ইচ্ছা ছিল আসামীদের নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবার। কিন্তু জমিদারবাবু রাজী নন। আর তাঁর যখন মত নেই তখন আসামী চালান হ'তেই পারে না। দারোগাসাহেবেরও একটাই প্রাণ। তাছাড়া এই এলাকা থেকে তিল কুড়িয়ে যে তাল তিনি বানান তাতে যেচে বাদ সাধবার মত বুদ্ধিহীন তিনি নন। ফলে সরকার তরফের সাক্ষিগোপাল হ'য়ে তাঁর নির্দিষ্ট আসন আলোকিত ক'রে বসে থাকেন তিনি।

আরম্ভ হয় বিচার। রামচন্দ্রের আমল নয় যে—দোষী নিজে জানিল না অপরাধ তাব, বিচার হইয়া গেল তবু। মোগল বাদশার আমলও নয় যে 'শাস্তি দিলাম' অর্থাৎ বিচার হ'য়ে গেল। এ হ'ল খাস বৃটিশ আমল। আইন তাদের সুদূর সাগর পারের দেশ থেকে সযত্নে আনয়ন করা। এখানে 'বিচার করলাম' বললেই বিচার হয়না। লিখে দিতে হয় বিচারককে যে যথেষ্ট সন্তোষজনক সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইত্যাদি। সেই শিক্ষাই পেয়েছেন জমিদারবাবু। খুঁত থাকতে পারবে না বিচারে। অতএব সাক্ষীর প্রয়োজন। আসে সাক্ষী।

এই সামান্য সময়টুকুব ভেতরেই মনে প্রাণে বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছে আব্দুর। যা হয় হ'ক। এই জঘন্যতার ভেতরে বাস করবার চাইতে মরে যাওয়াও শ্রেয়। আর সাক্ষী! ওরা কি মানুষ? সামান্য করুণার জন্যে মাথাব চুল পর্যন্ত স্বেচ্ছায় বিকিয়ে বসে আছে। তবুও এরই ভেতরে একটু সান্ত্বনা পায় সে এই দেখে যে যাদের ওখানে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল অজ্ঞান ফুল্‌কিকে তাদের বেশীর ভাগই গরহাজির। গরলের দেশেও অমৃতের সন্ধান মেলে তাহ'লে?

প্রথম সাক্ষীর মিথ্যাভাষণ শেষ হওয়ার আগেই চেঁচিয়ে ওঠে ফুল্‌কি—"না।" সেই তীক্ষ্ণ প্রতিবাদধ্বনিতেও চমকায়নী আব্দুর। শুধু একবার তাকিয়ে দেখে তরোয়ালের মত ঋজু দেহ ফুল্‌কির উত্তেজনায় থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে।

থামে না ফুল্‌কি। এগিয়ে চলে তার প্রতিবাদ জানিয়ে, "আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসিনি। আসবার কারণও ছিল না কিছু। বাবাকে বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমাকে চুরি করানো হয়েছিল কতকগুলো জানোয়ারকে দিয়ে। আর সেই জানোয়াদের যে পাঠিয়েছিল সে ঐযে, ঐ দাঁড়িয়ে !"

এক পাশে দাঁড়িয়ে নায়েব নলিনীকান্ত। ফুল্‌কির হাত তাকে নির্দিষ্ট করে দিতেই সট্‌ ক'রে সে সরিয়ে নেয় নিজেকে জনতাব আড়ালে। তার সরে যাওয়া দেখে এক মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি একটু থামে ফুল্‌কি, তারপরই আবার আরম্ভ করে। পশুর অত্যাচাব অনেক সহ্য করেছে সে। কিন্তু পশুর বিচার সহ্য হবে না তার। নিজেত' সে মৃতের তালিকাভুক্ত আজ, এদেরও প্রাণের আনন্দে পৃথিবীর সুখভোগ করবার জন্যে ফেলে রেখে যাবে না। ভদ্রতার মুখোশ টেনে ছিঁড়ে তাদের নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ করে দিয়ে যাবে পাঁচজনের সামনে। মনুষ্য সমাজে আর যেন কোনদিন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। নায়েবেব দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে জমিদারবাবুব দিকে তাকায় সে। আগুন আর ঘৃণা মিশ্রিত সে দৃষ্টি। মনুষ্য-দেহী একটি পিশাচ যেন বসে রয়েছে সেখানে। ফুল্‌কির হাতেব নির্দেশনা এবারে ঐ বিচারকের দিকে হ'তেই চম্‌কে ওঠেন জমিদার-বাবু। ধারণাও করতে পারেননি তিনি, নির্জীব গৃহস্থ ঘরে জন্মায ফণিনীর অংশধারিণী। নর্মসহচরী শুধুত' ফুলকিকেই করেননি। আরও কত এসেছে অন্ধকারের আববণে তাদের সতীত্বের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে। কেউ কেউ আজও বাস করছে এতদ্দেশে তাদের স্বামী-পুত্র নিয়ে। আর যারা এসেছে ঐ ফুলকির রাস্তা ধরে তারা আজ সৃষ্টি করেছে তাদের নতুন ডেরা ডায়মণ্ড হারবারের কাছা কাছি। কাকদ্বীপের কোন কোন মানুষ কাজে কর্মে ডায়মণ্ড হারবার গেলে ওদের ঘরেই নাকি আশ্রয় নেয় একটি রাতের খাজনায়।

তারা নির্বিষ। ঢোঁড়া সাপের ফণাটিও নেই। কিন্তু এ শুধু ফণারই অধিকারিনী নয়, বিষধরীও বটে। চমকে উঠেই চেঁচিয়ে ওঠেন জমিদারবাবু—"হারাণ!"

তৈরীই ছিল হারাণ। কাপড়ে জড়ান কতকগুলি যন্ত্র এবং এক ঘটি জল নিয়ে ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ায় সামনে।

"ওদের দু'জনের মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে এই কাকদ্বীপের বাইরে বার ক'রে দিবি।"

নির্বিকার আব্দুর। বুকের আগুনের আভা তার সেই পাথরে গড়া মুখের ওপরে এসে পড়ে না। কিন্তু চীৎকার করে ওঠে ফুল্‌কি। আঘাত যদি বা সহ্য হয়েছে তার, সহ্য হবে না এই অপমানের জ্বালা। শরীরের সমস্ত গ্লানি উপেক্ষা করেই ছুটে বেরিয়ে যেতে যায় সে। পারে না। সতর্ক নিমক্‌খোর প্রহরীর দল। ধরে নিয়ে জোর ক'রে বসিয়ে দেয় হারাণের সামনে। পুরুষানুক্রমে জমিদার বাড়ির ক্ষৌরকার হারাণ। তার জন্যে জমি ভোগ করে জমিদারের। উপরন্তু এ কাজের পৃথক পুরস্কার প্রাপ্তির আশা রাখে সে। দ্রুত হাতে ফুল্‌কির মাথায় কিছুটা জল ঢেলে দিয়ে ভিজিয়ে নেয় তার ক'দিনের অযত্ন-রক্ষিত কুঞ্চিত কেশের বোঝা। তারপর আরও দ্রুত চালিয়ে যায় তার ক্ষুর। যার প্রতি যত্নে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিলনা ফুল্‌কির, যা ছিল তার অহঙ্কারের বস্তু, মনুষ্যত্বহীনতার পোঁচে পোঁচে গুচ্ছ গুচ্ছ হ'য়ে পড়তে থাকে তা তারই পায়ের কাছে। আর তা নতুন ক'রে ভিজিয়ে দিতে থাকে ফুল্‌কির লাঞ্ছনা জর্জরিত দুটি চোখের জল।

মুণ্ডিত মস্তক ফুল্‌কিকে টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে ঘাড় চেপে ধরে বসিয়ে দেওয়া হয় আব্দুরকে। রুক্ষ চুল, সদ্য-ক্ষরিত রক্তে জট বাঁধা। হুকুম পালন করতে গিয়ে খুনের দায় না ঘাড়ে চাপে, ভয় হয় হারাণের। সাবধানে এগুতে থাকে সে। নিস্তব্ধ পরিবেশ। দৃষ্টি নিবদ্ধ সকলের হারাণের ক্ষৌরকার্যের দিকে। উন্মুখ তারা

পরবর্তী দৃশ্যটি দেখবার আশায়। এমন সময় বিকট এক মরণ চীৎকারে চমকে ওঠে সেই বিচারের প্রহসন সভা। লাফিয়ে ওঠেন দারোগাবাবু। থেমে যায় হারাণের হাতের কাজ। 'খুন, খুন হ'য়েছে নায়েব মশাই' চীৎকারের আলোড়ন সৃষ্টি হ'য়ে যায়। মিশ্রিত ধ্বনির ভেতর থেকে মাঝে মাঝে স্পষ্ট শোনা যায় কোনও কথা। এগিয়ে যান জমিদারবাবুও। 'খুনি ধরা পড়েছে' 'সাহস কত বড় শালার, খুন ক'রে সেখানেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। "ফুলকির বাপ।"

কথাটি কানে যেতেই চমকে ওঠে ফুলকি। তার বাবা খুন করল শেষে! খুনি! বেশ করেছে, পাল্টে যায় তার চিন্তাধারা, ওসব লোককে খুন করাই উচিত। পারেল আব্দুরও খুন করত ঐ জমিদারকে। স্পষ্ট চোখের দৃষ্টি মেলে তাকায় সে আব্দুরের দিকে। প্রপিড়ীত এ'দুটি মানুষের দিকে নজর দেবার মত অবসর নেই কারও। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় আব্দর। উত্তেজনা-হীন, ধীর স্থির। তাকায় ফুল্‌কির দিকে।

"কোথায় যাবে এখন?" জিজ্ঞাসা করে সে:

"জানিনা।" উত্তর দেয় ফুল্‌কি।

"তাহ'লে চল।"

চলতে থাকে ফুল্‌কি আব্দুরের পাশে পাশে। অত্যাচারের দেশ ছেড়ে। পরম নির্ভয়ে।

কাকদ্বীপ থেকে ডায়মণ্ড হারবারের পথ। সে পথ নয়। পথের নিশানা শুধু। ভয়ের কারণ ছিল পদে পদে। সেই পথই সম্বল করে দুইটি সর্বহারা নরনারী। রাতের আশ্রয় বৃক্ষতল, দিনের আশ্রয় পথ। যার শাখার অন্ত নেই। কখন কোন শাখায় এসে প্রবেশ করেছে তা তারা নিজেরাও জানে না ভাল। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌছয় লক্ষ্মীকান্তপুরের কাছে। সান্নিধ্য আর সহানুভূতিতে

মনের রূপের পরিবর্তন হ'য়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। সমাজ-হারা দুটি মানুষ এক নতুন সমাজ খুঁজে পেয়েছে তাদের ভালবাসার ভেতর দিয়ে। আর সেই ভালবাসারই ফল শহীদান।

"চাচা অনেক খোঁজ খবর ক'রে আমাদের বাড়ি খুঁজে বের ক'রেছিল," কাদেরকে বিশ্রাম দিয়ে নিজে বলতে থাকে শহীদান, "কিন্তু বা-জান বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেয়নি তাকে। শুধু ঢুকতে দেয়নি তা নয়, লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে গ্রাম ছাড়া করেছিল তাকে। তারপর বছর কয়েক আর কোন খোঁজ খবর নেই চাচার। বা-জানও নিশ্চিন্ত মনে নতুন করে মেতে উঠেছিল তার কাজে। ইতিমধ্যে কিছু জমিজমাও করেছিল। আরও করবার আশায় প্রাণপণ খাটত। আমি কতদিন শুনেছি বা-জানের অত খাটুনির জন্যে মা ভীষণ বকাবকি করেছে তাকে। বা-জান শুনত আর হাসত হা-হা করে। বছর বার চোদ্দর ভেতরেই প্রায় বিঘে কুড়ি জমি হয়ে গেল আমাদের। লাঙল আর বলদও হ'ল। আবার যাতায়াত করতে লাগল চাচা। দূর থেকেই খোঁজ খবর নিয়ে যায়।

এমনিই একদিন, চাচা তখন সেই গ্রামে, এমন সময় বা জান আর মা দু'জনেই কয়েকদিনের আগুপাছু আমাকে ছেড়ে চলে গেল।"

"কিন্তু একটা কথা হুজুর," শহীদানের কথার মাঝখানেই বলে ওঠে কাদের, "দু'জনে ভাব ছিল খুব। শহীদানও জন্মাল, কিন্তু বিয়ে ওদের হয়নি।"

"তোমার আপত্তি আছে তাতে?" মহিমবাবুর প্রশ্ন খুব মোলায়েম নয়।

প্রশ্ন শুনে শহীদানের মুখের দিকে একবার তাকায় কাদের। তারপরই মাথা নিচু করে ফেলে বলে, "না হুজুর।"

সম্পত্তি হস্তান্তরের হাকিম। সম্পত্তির কথাই আগে মনে

জাগে তাঁর। জিজ্ঞাসা করেন, "আব্দুর রহমানের জমিজমা এখন কে পাবে?" উত্তরও মেলে তার। দলিল ক'রেই রেখেছিল আব্দুর। তাতে স্পষ্ট লেখা ছিল, সে মারা গেলে তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে ফুল্‌কি। ফুল্‌কিও যদি না থাকে তাহ'লে তাদের একমাত্র কন্যা শহীদান পাবে সমস্ত সম্পত্তি।

"সেই লোভেইত' চাচা গিয়ে নিয়ে আসে আমাকে। অবশ্য আমারও তখন একটু আশ্রয়ের দরকার হ'য়ে পড়েছিল। চাচার এখানে প্রথম প্রথম বেশ খাতির পেতাম। আমিও কেমন ভুলে গেলাম ওদের ব্যবহারে। যা জানতাম সমস্তই একে একে বলে ফেললাম আয়েজান বিবির কাছে। তারপরই কেমন বদলে গেল ওরা। শুধু চেষ্টা করতে লাগল কি ক'রে আমার সর্বনাশ করবে।"

"সে রাস্তাত' খোলাই ছিল হুজুর," কাদের বলে ওঠে, "আমার শাশুড়ীর বদনামের ভয় দেখিয়েই শহীদানকে দিয়ে তালাক দেওয়াতো। দু' বার তালাক দেবার পর সাদী করলাম আমি। আমার বেলাতেও ঐ ব্যবস্থা হতেই খোঁজ নিতে আরম্ভ ক'রে জানলাম ডায়মণ্ড হারবারের জমিজমার কিছু অংশ আছে আয়েজান বিবির নামে। এটা সে করিয়ে নিয়েছিল চাচাকে নিকে করবার আগে। আমিও সেখানেই দিলাম কোপ।"

"এখন আমি কি করব বাবা?" শহীদানের চোখে ঘনায়মান বাষ্পের ভার, "উকিল সাহেব বলেছে, ওকে নাকি জেল খাটতেও হ'তে পারে। একে উইল জালকরা, তার ওপর মাথা ফাটিয়েছে চাচার। তাই শুনেইত' ছুটে গিয়েছিলাম—"

"মামলার তদ্বিরের জন্যে এখানেই আছি হুজুর," এখানে আসবার কাহিনী বলে কাদের শহীদানের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে, "বৃষ্টি বাদলার রাত, মনটাও খারাপ, এমনভাবে আমার জীবনটা বরবাদ ক'রে দিল শহীদান! হঠাৎ নজরে পড়ে কে একজন মেয়েছেলে বৃষ্টির ভেতরেই ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছে। প্রথমটা ঠাহর হয়না

ভাল। একটু কাছে আসতেই চমকে উঠি। ওর চলাত' আমার চেনা। কেমন যেন হ'য়ে গিয়ে ঠায় বসে থাকি। একটু পরেই হুড়মুড় করে এসে পড়ে ও আমার পায়ের কাছে। সেইখানেই শুনি সব কথা। তারপর দু'জনে বেরিয়ে পড়ি আপনার এখানে আসবার জন্যে।"

"তাত' বুঝলাম, কিন্তু যদি আবার তালাক দেয় ও?" কৌতুক করতে গিয়ে বেকুব হয়ে যান মহিমবাবু। পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে পড়েছে শহীদান, "না, না, আমার ঠাঁই যে আমি পেয়ে গিয়েছি বাবা।"

"তাহলে ঠিক আছে," এবার হাকিমি মত দেন মহিমবাবু, "তুমি তোমার চাচাকে মামলা তুলে নিতে বল।"

"তুলবেনা। বড় ভীষণ মানুষ সে। তার ওপরে আছে ঐ কালনাগিনী।"

"নেবে," জবাব দিয়েই বলেন মহিমবাবু, "তার লোভেই তাকে দিয়ে নেওয়াবে। তোমার চাচাকে বললে মামলা তুলে নিলে তোমার লক্ষ্মীকান্তপুরের জমি তুমি ওর নামে লিখে দেবে।"

কথাটা শুনেই ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসে শহীদান। অন্ধকারের ভেতর থেকে হঠাৎ যেন পথের রেখা জেগে ওঠে তার চোখের সামনে।

"হয় বাবা, তা কি হয়," বলেই উত্তেজনার মুখে জোর গলায় বলতে গিয়েই মুখ নামিয়ে নিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, "আর ফকির হ'য়ে দিতে না পারলে দেওয়ার দাম থাকে কোথায়?"

আবার হাসেন মহিমবাবু। এরা ঘরে এসে বসবার পর যেমন হেসেছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে কাদের, এবারে হাসির কারণটা বলতে হবে। বলেন মহিমবাবু, "তোমাদের দেখেই মনে হ'য়েছিল, দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না। অথচ কপালের ফেরে ঘুরপাক খেয়ে মরলে শুধু। তাই হেসেছিলাম।

এখন এক কাজ কর—তালাক-নামা নাকচ করবার জন্যে একটা দলিল তৈরী ক'রে নিয়ে এস, আমি রেজিষ্ট্রী করে দেব।"

বলে উঠে দাঁড়ান মহিমবাবু। শেষ হ'য়ে এল রাত। স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেণ ছাড়বার সিটি শুনেছেন একটু আগে। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে ওঠে দাঁড়ায়। ওঠেন না শুধু লক্ষ্মীদেবী। সম্পূর্ণ টা শোনা হয়নি তাঁর। কিন্তু যা শুনেছেন তাতেই বিমুগ্ধ তিনি। ভালবাসাকে যেন নতুন ক'রে শিখলেন আজ।

একঝাঁক দলিল সই হয়ে যাওয়াব পর একটু বিশ্রাম পেয়ে খাস কামরায় গিয়ে বসেন মহিমবাবু। এই অবসবটুকুই যেন মনেপ্রাণে চাইছিলেন তিনি। কয়টি নাম অবিবত ধাক্কা মেরে চলেছে তাঁব মনের কপাটখানির ওপরে। অনুরূপবাবু, চিন্তাহরণবাবু, নীহারেন্দু, সুদর্শন গুঁই। আশ্চর্য! অনুরূপবাবু আব বিয়ে করবেন না স্থির করেও শেষে এমন জায়গায় বিয়ে কবে বসলেন যে নিজেব অজান্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন তুটি সুন্দর জীবনকে। দোষ তাঁকে ঠিক দেওয়া চলে না, তবুও যেন ক্ষমা কবতে পারছেন না তাঁকে। থেকে থেকেই মনে পড়ছে নীহারেন্দুব কথাগুলি। যে কথায় ব্যথা ছিল, কিন্তু আক্রোশ ছিল না। অল্প কয়েকটি কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিল বাঁচবার এক প্রবল আকাঙ্খা নিয়ে নীহারেন্দু আর সুহাসিনী, তুজনেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তু'জনার দিকে। কিন্তু চিন্তাহরণ-বাবু নিজের কথার খেলাপ ক'রে ওদের তুজনের মাঝখানে তুলে দিলেন এক বিরাট প্রাচীর। ব্যর্থ কবে দিলেন তুটি জীবনকে, অবলীলাক্রমে, আপন কথার কোন মূল্য না দিয়ে।

শুনেছিলেন আনুপূর্বিক সমস্তই। অনুরূপবাবুর বিয়ে। তাও আবার যেমন তেমন নয়। অভিনয়ের পুরস্কার। পুজোর পর বিজয়া সম্মিলনীতে মিত্তিরবাবুদের বাড়িতে কৃষ্ণকান্তের উইল নাটক অভিনীত হয়। নাট্যরূপ দাতা অনুরূপবাবু। পরিচালক এবং

গোবিন্দলালের ভূমিকাতেও তিনি। নাটক দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন চিন্তাহরণবাবু। নিজে যেচে এসেই আলাপ করেছিলেন অনুরূপ-বাবুর সঙ্গে। তারপর একদিন তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর বাবার সঙ্গেও আলাপ করেছিলেন চিন্তাহরণবাবু। তখনও জানত না কেউ এ আলাপের মোড় ঘুরছে কোন দিকে। জানতে পারল সেদিন যেদিন বেড়াবার আছিলায় এসে অনুরূপবাবুকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন তিনি। নিথর ডায়মণ্ড হারবারে একটা ঢেউ জাগল। নাটক ক'রে মানুষে মেডেল পায় আর অনুরূপবাবু পেলেন বউ।

সেই বিয়েতে গিয়েই আলাপ হয় নীহারেন্দুর সঙ্গে। বিয়ে-বাড়ীতে নয়। নীহারেন্দুর বাড়ীতেই। একটু বেড়িয়ে দেখতে বেরিয়েছিলেন গ্রামটিকে। সন্ধ্যা তখন গৃহস্থের ঘরেই নেমেছে শুধু, মাঠের বুকে নামেনি। পথ দেখা যায় স্পষ্ট। এগিয়ে চলতে থাকেন তিনি গ্রামের চেহারা দেখতে দেখতে। এ যেন বাংলাদেশের এক অচেনা গ্রাম। এত অনুন্নত গ্রাম যে বাংলাদেশের কোথাও আছে এ তাঁর ধারণাতেও ছিল না। রোদ পড়েনা রাস্তায়। সবুজ আস্তরণ পড়েছে কাদার ওপরে। পথের দু'ধারে জিগে গাছের গায়ে থিক্ থিক্ করছে শোঁয়াপোকা। আর তাদের পূরীষে গাছের গোড়ার মাটি গিয়েছে কালো হ'য়ে। এখানে ওখানে শুধু ডোবাই চোখে পড়ে। শ্রদ্ধাহীন মন। তবুও চলেছেন এগিয়ে। বাঁ ধারে কাদের বাড়ী। বারান্দার সিঁড়ির ওপরে বসে এক বিধবা ভদ্রমহিলা আর একটি যুবক। বোধহয় মা আর ছেলে। সেদিকে একবার তাকিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকেন মহিমবাবু। এমন সময় ছেলেটি বলে ওঠে—"চিন্তাহরণবাবু যে এমন ভাবে তাঁর কথার খেলাপ করবেন, আমি ভাবতেও পারিনি মা।"

কথাটা কানে যেতে একটু থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলেন মহিমবাবু। তারপর আবার এগুবার জন্যে পা বাড়াবেন, এমন সময় ছেলেটি প্রায় ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সামনে।

"সার! আমি আপনাকে চিনি। একদিন গিয়েছিলাম ডায়মণ্ড হারবারে, আপনার এজলাসে। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে সার।"

প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই হাতজোড় করেছিল নীহারেন্দু। উপেক্ষা করতে পারেননি মহিমবাবু সে অনুরোধকে। গিয়েছিলেন নীহারেন্দুর সঙ্গে তাদের বাড়িতে। শুনেছিলেন সব। একখানা চিঠিও দেখিয়েছিল ছেলেটি। বছর কয়েক আগের লেখা। চিন্তাহরণবাবু কাশী থেকে লিখেছিলেন নীহারেন্দুর বাবাকে। কয়েকটি মাত্র বাক্য, তার ভেতরেই ধরা পড়েছিল সম্পূর্ণ কাহিনীটি। চৈত্র কিস্তির টাকার ব্যবস্থা করে রেখে চিন্তাহরণবাবু কাশী গিয়েছিলেন তীর্থ করতে। ছেলের ওপরে হুকুম ছিল নীহারেন্দুর বাবার সঙ্গে গিয়ে টাকাটা জমা দিয়ে দেবার। বিপদ বাধাল চোরে। কান্নাকাটি পড়ে গেল বাড়িতে। কয়েকটা দিন মাত্র সময় হাতে। এর ভেতরে টাকা জমা পড়ে ভাল, নৈলে জমি উঠবে নিলামে। সেই সময় নীহারেন্দুর বাবা সেই সংসারটির ত্রাণ-কর্তার মতই এগিয়ে এসেছিলেন। আপন জমির কিছু অংশ বন্ধক রেখে মিটিয়ে দিয়েছিলেন চিন্তাহরণবাবুর কিস্তির টাকা। এ ঋণ নাকি তাঁর শোধ দেবার মত ক্ষমতা নেই। তবুও তাঁর মেয়েকে নীহারেন্দুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এবং কিছু জমি যৌতুক-স্বরূপ দান ক'রে উভয় পরিবারকে আত্মীয়তা সূত্রে বাঁধতে চান তিনি। এখন নীহারেন্দুর বাবা মত দিলেই হয়।

'বাবাও মত দিয়েছিলেন' নীহারেন্দু বলে, 'কিন্তু শেষ অবধি আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি গেল সরে। সুদর্শন গুঁই নামে আমাদের এক কর্মচারী ছিল। বাবার নাম জাল করে আমাদের সরষে গ্রামের জমিগুলি অন্যের কাছে বিক্রী করে দেয়। জানতে পারলেন বাবা কিস্তির টাকা আদায় করবার সময়। তারপরই শয্যাগত হয়ে পড়লেন তিনি। আমি তখন ক'লকাতায় থেকে

কলেজে পড়ি। খবর পেয়ে ছুটে এলাম। চেষ্টাও করলাম অনেক, কিন্তু কিছুই হ'ল না।"

একটানা কথাগুলি বলে একটু দম নেবার জন্য থেমে যায় নীহারেন্দু। তারপর বলে—"কিন্তু আপনাকে এই শোনাবার জন্যে কষ্ট দিয়ে ডেকে আনিনি সার। জমি রেজেষ্ট্রী করতে হ'লে একটা রেজিষ্টারেও তো সই করতে হয়। আমি জানতে চাই বাবার নাম দিয়ে জমিগুলি বিক্রী করবার সময় সুদর্শন গুঁই রেজিষ্টারে সই করেছিল কিনা ? অর্থাৎ সেটা তার সই কিনা।

"সে কথা বলতে পারে হস্তলিপি বিশারদ," উত্তর দেন মহিমবাবু, "কিন্তু সেত' আমার অফিসে নেই। আলিপুর সদর অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। কিন্তু তার আগে অন্য কোন প্রমাণ পান কিনা চেষ্টা করে দেখুন।"

তারপর আর সেখানে থাকেননি মহিমবাবু। চলে এসেছিলেন বিয়েবাড়ী। কিন্তু পূর্ব্বের মেজাজ আর থাকেনি। এমন কি ফেরবার পথে গরুর গাড়িতে বসে কাবলী আর পবনকে দেখেও উৎসুক হ'য়ে উঠতে পারেনি। সমুৎসুক পল্লীবাসী এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তার ধারে, বর-কনে দেখিতে। তাদের ভেতরে দাঁড়িয়েছিল পবনরা। কি একটা কথাও যেন বলেছিল পবন। উত্তরে মুখ ভেংচে উঠেছিল কাবলী। দেখেছিলেন সব, শুনেছিলেনও অনেক কিছু কিন্তু মনে বসেনি তার একটিও। শুধু ভেবে চলেছিলেন এমনটা কেন করলেন চিন্তাহরণবাবু।

গত দু'দিন ধরে যে চিন্তা তাঁকে বারে বারেই অন্যমনস্ক করে দিয়েছে, আজও সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি তিনি মন থেকে। খাস কামরায় বসেও তার কারণটি হদিস্ করবার চেষ্টা করছিলেন এমন সময় একটা চীৎকার শোনা যায় এজলাসের ভেতরে। কে যেন 'হুজুর, হুজুর' বলে পরিত্রাহী চীৎকার করছে। চমকে ওঠেন মহিমবাবু। তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ান এজলাসে। একটি লোক

জোর ক'রেই আসতে চাইছে হুজুরের দিকে। কিন্তু আসতে দেবেনা তার স্ত্রী। কাছা টেনে ধরেছে পিছন থেকে। একা নয় সে। সঙ্গে তিনটি শিশু। তারাও একটানা চেঁচিয়ে চলেছে শিশুকাকের মত। লোকটির হাতে একটি দলিল। উঁচু ক'রে ধরে রেখেছে সেটা। আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক বলছে, 'আহা ছেড়ে দাওনা ওকে। তোমার কষ্ট কি ? আমিত' আছি, আমিই দেখব।'

'তুই কোের মুখপোড়া যে আমাকে দেখবি ?' মুখঝাম্‌টা দিয়ে ওঠে স্ত্রীলোকটি, 'বলি যে ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দেছেল বাপ, সেই বড় দেইকচে', বলেই সে তাকায় এজলাসের দিকে, ডুক্‌রে উঠে আবেদন জানায়, 'দেকুন হুজুর, আমার কি সব্বোনাশ করতেছে এই বাউণ্ডুলে মাতাল। মদের টাকা জোগাড় করবার জন্যে এই বাচ্চাগুলোর মুখ মেরে জমিন্ বিক্রী করতেছে ঐ কষাইএর ঠেঙে। মইরে যাব হুজুর, এই বাচ্চগুলোন শুইকে মারা পড়বে।' আশাভরা দৃষ্টি তার হাকিমের মুখের উপরে নিবদ্ধ। নিমজ্জমান মানুষের প্রাণের আকুলতা সেই দৃষ্টিতে। দেখাই সার, বলবার কিছুই নেই তার। আইনানুগ ভাষা হাকিমের। 'ব্যবসায়ে বন্ধুত্ব নেই' এর মত হাকিমগিরিতেও নেই মানবতার অবকাশ। তবুও এজলাসের একটা সম্মান আছে। আর সেই খাতিরেই বলতে হয় তাকে—'আঃ, এখানে গোলমাল ক'রোনা, বাইরে যাও।'

গোলমাল শুনে এজলাসের দরজার সামনে এসে জড়ো হয় কয়েকজন উৎসুক মানুষ। তাদের ভেতর থেকে ওঠে গুঞ্জন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই লোকটির। ধৃত-কচ্ছ অবস্থাতেই একটু একটু ক'রে এগুতে থাকে হাকিমের টেবিলের দিকে। শুনতে পান মহিমবাবু, মাথাটাকে একটা ফাইলের আড়ালে রেখে চাপাস্বরে স্ত্রীলোকটিকে বলছে হরনাথ—'দলিলখানা কেড়ে নিতে

পারছনা?' তিনি ও মনে মনে বলেন—তাই নিক্। ঐ পাপ কেড়ে নিয়ে মুক্তি দিক তাঁকে আর এক পাপের হাত থেকে।

পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে স্ত্রীলোকটি। শিথিল হ'য়ে আসছে তার মুষ্ঠি। ক্রমেই খসে আসছে কচ্ছাংশ। সে দৃশ্য দেখে হাকিমের বুকখানিও বুঝি কেঁপে ওঠে একটু। একবার তাঁর টেবিলের ওপরে দলিলখানি ফেলতে পারলেই অতগুলি প্রাণীকে জবাই করতে পারবে লোকটি। হাকিমের সাধ্যও হবে না সে দলিল ফিরিয়ে দেবার। কিন্তু না, চরম সর্বনাশ হ'তে পারে না। মৃত্যুর পূর্বে জ্ঞান ফিরে আসবার মত নিঃশেষে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলবার পূর্বমুহূর্ত্তে ক্ষণিকের জন্যে পূর্ণশক্তি ফিরে পায় বুঝি স্ত্রীলোকটি। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির একটি পা ধরে হ্যাচ্কা টান মারে শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। ফলে হাকিমের টেবিলের কাছে এসেও ফিরে যায় সেই অভিশপ্ত দলিল। মুখ থুবড়িয়ে পড়ে যায় লোকটি মেজের ওপরে। আর লহমা মাত্র বৃথা নষ্ট না করে চিলের মত ছোঁ মেরে সেখানা কেড়ে নেয় তার স্ত্রী। তারপর আর নড়বারও শক্তি থাকেনা তার। বুকের সঙ্গে সেখানা চেপে ধরে সেইখানেই বসে পড়ে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কাঁদতে থাকে সে। কেঁদেই ক্ষান্ত হয় না। ফালা ফালা করে ছিঁড়তে থাকে তার সর্বনাশের সাক্ষর আঁকা দলিলখানা। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নয় সে। যে সর্বনাশ একবার হ'তে চলেছিল তা যে আবার হবেনা তারই বা বিশ্বাস কি? তাই একটু পরেই লাফিয়ে ওঠে সে।

"হুজুর! এই মানুষটাক্ একটুকুন আইট্যকে রাখফেন হুজুর, হাতজোড় ক'রে বলে স্ত্রীলোকটি, "আমি একজন উকিল ডেইকে নে'সি।"

বলে বটে কিন্তু যাওয়া হয় না তার। দরজার কাছে গিয়েই দাঁড়িয়ে যায়। যে মানুষ, হয়ত দৌড়ে পালিয়ে যাবে। আর তাহ'লে ও জমি পরের গর্ভে যাবেই। দরজার কাছ থেকেই

মুখ বাড়িয়ে একজন মুহুরীকে ডাকে। তাকে দিয়েই স্ট্যাম্প কাগজ, ডেমি প্রভৃতি আনিয়ে লিখিয়ে নেয় দানপত্র। ছেঁড়া দলিল থেকেই পাওয়া যায় জমির পরিমাণ আর সীমানা নির্দেশ। তারপরই লোকটিকে ধরে জোর ক'রে টিপসই দিইয়ে নেয় সেই দানপত্রে। শুধু এজলাসের আইন বাঁচিয়ে দরজার ঠিক বাইরে বসে করতে হয় সব।

সানন্দে সেই দলিলে সই ক'রে দিয়ে ভাবতে থাকেন মহিমবাবু —যত না ঘাট, ঘটনা তার চাইতে কত বেশি আর কত না বিচিত্র তার রূপ। ক্ষমতা কি তাঁর হদিস্ করতে পারেন কুলকিনারাহীন এই মানবমনকে।

তবুও মনের গতির প্রথম পাতাতেই তখনও মহিমবাবু। দ্বিতীয় পাঠের খোঁজ মিলল তারও কয়েক মাস পরে, পর পর দুইটি ঘটনায়। শীত পড়বার মুখেই স্ত্রীর কাছ থেকে একটি উপহাব পেয়েছেন। পুত্র সন্তান। তারপর এল শীত। উত্তরের মেঠো হাওয়া লেপ ভেদ কবে হাড়গুলো ধরে নাড়া দেয়। অফিসে যাওয়ার সময় কোটের আস্তরণের ওপর কিশোর রোদ বেশ আরাম দেয়। কাজ সেবে বাড়ো ফিরবার মুখে দিনমণির বার্দ্ধক্য-জনিত শীতলতায় সেই কোটকেই মনে হয় স্রেফ বালির পলেস্তারা, সিমেণ্ট নেই তাতে এক কাঁচ্চাও। এক কাপ গরম চায়েব প্রলোভন দৌড় করিয়ে নিয়ে আসতে চায় তাঁকে। পারেন না শুধু পদ-মর্য্যাদার বোঝার চাপে। গৃহকোণের উষ্ণতাও গিয়েছে কমে। নবজাতকের বেড়া দিয়ে একই ঘরকে দু'সবিকে দাঁড় করান হয়েছে। টেনু ও পক্ষে। এ পক্ষের নাত্‌নীরাম শুধু শোয় এখানে রাত্রে। খাওয়া দাওয়ার পাট তার দেশোয়ালিদের সঙ্গে কোর্টবাড়িতেই সারে। ফলটা দাঁড়িয়েছে এমন যে যখন মহিম-বাবু একটু চায়ের জন্য টেনুকে খুঁজছেন তখন সে হয়ত' গিন্নীমার হুকুমে ছাগলের দুধ খুঁজতে খুঁজতে বাস্থুলডাঙ্গার কাছে চলে

গিয়েছে। মাঝে মাঝে আশ্চর্য হ'য়ে ভাবেন তিনি, একটি সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এতটা পর হয়ে গেলেন কি করে? এই কি মেয়েদের বৈশিষ্ট্য? নাকি ওরা ভালবাসা ভাগ ক'রতে জানেনা? যাকে দেয়, আঁচল উপুড় করে দিয়ে বসে থাকে!

আসলে লক্ষ্মীদেবী খুব গোছাল গিন্নী নন। এক একজন আছেন যাঁকে বলা যায় চৌকস। একদিকের কাজ করতে গিয়ে অপর-দিক সম্বন্ধে অন্ধ হ'য়ে যান না। লক্ষ্মীদেবী তা পারেন না। এক কাজের সঙ্গে অপর কাজের তাল মেলাতে পারেন না তিনি। তবুও একরকম ভাবে চলে যাচ্ছিল এতদিন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনার সংসারে ছোট ছোট কাজের তাগাদা কম। এখন পুত্রের কল্যাণে টুকরো কাজের চাপ এত বেড়েছে যে দিশাহারা হ'য়ে পড়েন লক্ষ্মীদেবী, আর স্বামীর কাছে তার অর্থ হয় অন্য।

অনেক বড় কিছু সয়ে যায় আবার ক্ষুদ্র কারণে আগুন জ্বলে ওঠে। সংসারের মেজাজের স্থিরতা নেই। সামান্য একটি প্যাণ্টের বোতাম নিয়ে যা নয় তাই কথা কাটাকাটি হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে। ঠিক এই জিনিসটি চাননি নহিমবাবু, আবার সামলে নিতেও পারেননি নিজেকে। ধোপার বাড়ি থেকে প্যাণ্টটা ফেরত আসতেই বলেছিলেন বোতামটা লাগিয়ে দিতে। সে আজ সাত আটদিন আগের কথা। 'করি' 'করব' ক'রে লক্ষ্মীদেবীও গিয়েছিলেন ভুলে। অফিসের বেলা হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি প্যাণ্ট পরতে গিয়ে খেয়াল ছিলনা, দেখেন বোতাম নেই। তারপরই এক কথা দু'কথা ক'রে বেশ কিছুটা বাগ্‌যুদ্ধ হ'য়ে যায়। মেজাজ খারাপ করেই বেরুতে হয় বাড়ি থেকে।

এজলাসে গিয়েও বিশ্রাম পান না মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার। দিন বুঝেও হাট বসেছে ক্রেতা-বিক্রেতার। এসেছে জয়দেব, নারোদ সামন্ত, হরিদাসী, পবন আর একজন অচেনা লোক। টেবিলের ওপরে রাখা তিনখানি দলিল। দলিল-

গুলো তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখেন তিনি। তিনখানিরই বিক্রেতা হরিদাসী আর পবন গায়েন। ক্রেতা জয়দেব, নীরোদ সামন্ত আর শুকদেব চ্যাটার্জি। দেখে শুনে মনে অনেক প্রশ্নই জাগে। কিন্তু নিছক কৌতূহলকে আজকাল আর প্রশ্রয় দেন না তিনি। মনের নরম পর্দার গায়ে কড়া পড়ে গিয়েছে এই একঘেয়ে কাজ করতে করতে। আর কৌতূহল প্রকাশ ক'রে কিংবা করতে পারেন তিনি? একই জমি একই দিনে পাঁচজন বিক্রী ক'রে গেলেও রেজিষ্ট্রী ক'রে দিতে বাধ্য তিনি। তারপর মাথা কুটুক গিয়ে তারা বিচারকের মন্দিরে। তবুও একবার জিজ্ঞাসা করতে হয় তাই করেন, "হরিদাসী গায়েন, টাকা পেয়েছ?"

হাকিমের জিজ্ঞাসা হয় চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী। কিন্তু হরিদাসী হকচকিয়ে যায় সে প্রশ্নে। কি একটা উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যায়। স্বর বেরুচ্ছে না তার গলা দিয়ে। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে হাকিমের দিকে। এবার থেকে ও আর এপক্ষের নীরবতার ভেতরে কোন একটা অর্থ খুঁজে পায় বুঝি পবন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে সে, "বিয়ে দিবিনি?" পুত্রের জিজ্ঞাসাই সজাগ ক'রে তোলে হরিদাসীকে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সে, "হ্যাঁ হুজুর।" বাস, আর কোনও জিজ্ঞাস্য নেই তার। যদি কারও থাকে, তাকে উপযুক্ত পরিমাণ অঙ্কের 'কোর্ট ফি' দিতে হবে। দলিল তিনটির বুকে হাকিমের নামের আঁচড় পড়ে।

মানসিক শান্তি অপহৃত। অর্থাৎ দপ্তরের কাজ আর ভাল লাগছে না। ঝামেলা যত কম আসে ততই ভাল। কিন্তু চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না। আর্থিক সম্পদও নয়, মানসিক শান্তিও নয়। টিফিনের সময় হ'তে কেবল খাস কামরায় ঢুকেছেন তিনি এমন সময় এসে জোটে নীরোদ সামন্ত।

"একটা কথা ছিল সার।"

মানুষটার কি সময়ের জ্ঞানও নেই? ইচ্ছা হয় কড়া সুরে

বলে দেন, টিফিন শেষ হলে আসবেন। কিন্তু শেষ হওয়ার বস্তুটিবই আজ অভাব। টিফিন আনা হয়নি আজ। কেমন একটা ঘৃণা এসে গিয়েছিল মনে। সহানুভূতিহীন মনের সাজান টিফিনের কৌটটা স্পর্শ করতেও প্রবৃত্তি হয়নি। দ্বিপ্রাহরিকের কাজটি শেষ হয়ে গিয়েছিল পূর্বেই নইলে হয়ত' তাও পড়ে থাকত অস্পৃষ্ট। নাত্‌নীরামকে ডেকে দোকান থেকে কিছু খাবার আনতে পাঠিয়ে দেন আগে। তারপর জবাব দেন নীরোদ সামন্তর কথার।

"বলুন।"

ঘরে ঢোকে নীরোদ উকিল। একটা চেয়ার দখল ক'রে বসে।

"করে ফেল্লাম কিছুটা জমি।"

"দেখলাম।"

"ঐ সেই কাবলার ব্যাপার," বলে পবন গায়েন আর কাবলীর ইতিহাসের শেষাংশ শোনাতে থাকে উকিল।

হয় খেলাও, নয়ত' খেল। হয় পাগল হ'য়ে যাও, নয়ত' পাগল ক'রে দাও। সবতাই মনের ঈপ্সা। কাবলীও ব্যতিক্রম নয় সে ক্ষেত্র থেকে। পবনের চেতনার অসদ্ভাবই এ সাহস দিয়েছিল তাকে। একটা [illegible] খেলা, [illegible] নেশায় পরিণত হ'য়ে গেল তা। কখন কখন মাত্রার গোলমাল হ'য়ে যেত কাবলীর। আর ঘরের ভেতর থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠত উপেন্দ। হরিদাসী কিন্তু হাসত ওদের রকম দেখে। মনের গোপনে যে দুরাশা পোষণ ক'রে আসছিল সে [illegible] সেটা আশায় পরিণত হ'তে থাকে। এই রকম একটি বউ ঘরে আনতে পারলে পবনের সম্বন্ধে আর কোন চিন্তাই থাকেনা তার।

নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছিল কাবলী। ঠক্ খেয়ে গেল অনুরূপবাবুর বিয়ে ক'রে ফিরে আসবার সময়ে। দ্বিধাহীন চিত্তে সে তারই সর্বনাশের বিষফল সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বর-কনে দেখতে। ভাবতে পারেনি যে অসাবধানতার খোঁচা লেগে ঝরে

পড়তে পারে বিষরস। তাই টোপর মাথায় বরকে দেখে পবন যখন তার বর সাজবার কথা বলে তখন সে রহস্য ক'রেই ছড়া কেটে ওঠে। কিন্তু পবনের কথা যে রহস্য নয়, খেপা মনের অসংবদ্ধ চিন্তার একটি টুকরো মাত্রও নয়, তা সে বুঝতে পারে একটু পরেই। বর-কনের গাড়ি চলেছে এগিয়ে। পথ পার্শ্ববর্ত্তী দর্শনার্থীর সঙ্গে কাবলীও এগুতে যাবে এমন সময় তার হাত চেপে ধরে পবন।

"তুই বেশ আমার বৌ, এঁ্যা? আমি বর সেজে বিয়ে করব তোকে।"

ঠিক এইরকম একটি পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলনা কাবলী। চম্‌কে ওঠে সে পবনের হাতের স্পর্শ পেয়ে। ভয়ের প্রথম ধাক্কা নিঃশেষে শুষে নিয়েছে তার মুখের সমস্ত রক্ত। এক মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপরই নিজেকে ফিরে পায় সে আপন মনের কঠিন দুর্গের অভ্যন্তরে। সেখানে সে কঠিনা, অনবনমিতা। এক ঝাঁটকায় মুক্ত করে নেয় আপন হাত। মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠে' "দূর, দূরহ' হতভাগা পাগলা কোথাকার।" বলেই হন্‌হন্ ক'রে হাটতে থাকে সে ঐ পবনদেরই ছাপড়ার উদ্দেশ্যে। নাছোড়বান্দা পবন। কাবলীর পিছন পিছন গিয়ে হাজির হয় হরিদাসার কাছে। চাৎকার ক'রে জানাতে থাকে তার বিয়ের দাবী। তাও শুনে এসেছেন মহিমবাবু। শোনেননি যা তা হচ্ছে জয়দেবের প্যাঁচ। অবশ্য জয়দেবের নাম দিয়েই চালিয়ে দেয় নীরোদ সামন্ত। কিন্তু মহিমবাবুর দৃঢ় ধারণা এর ভিতরে তার মস্তিষ্ক-প্রসূত বুদ্ধির অংশ কিছু কম নয়। নইলে হয়ত কোথাও না কোথাও আটকে গিয়ে জাল যেত ফেঁসে, আর তারই সুযোগ নিয়ে শিকার যেত পালিয়ে। যাই হ'ক, নীরোদ সামন্তর গল্প হচ্ছে—

পবনের উন্মত্ততা চোখ ফুটিয়ে দিল জয়দেবের। তার মেয়ের জন্যে পাগল পবন, আর হরিদাসীর এ এক মোক্ষম দুর্বল স্থান।

তখন এই সলকে কিছু গুছিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কূট-বুদ্ধির হাতের অস্ত্র কার্য-নির্বাহক। এক ব্যতিরেকে অপর পঙ্গু। পঙ্গু জয়দেবও। তাই জরুরি তলব যায় কাকদ্বীপে শুকদেবের কাছে।

শুধুই তলব, বার্ত্তা কিছুই নেই। যেমন আশ্চর্য তেমনি বিরক্তও হয় শুকদেব। ভয়? না, ভয় নেই তার একতিলও। বাপের যে সমস্ত কীর্ত্তির কথা তার জানা আছে তার একটিও যদি প্রকাশ পায় তাহ'লে ..। নইলে পুত্রের সকল অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য ক'রে যুবতী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে খালি হাতে কাকদ্বীপ ত্যাগ করবে কেন জয়দেব?

একা নয়, জোড়েই এসে উপস্থিত হয় শুকদেব। একটি মাত্র খোপের বাসিন্দা চারজন। পছন্দ নয় শুকদেবের। তলবের কারণটি জেনে তড়তাড়িই সে ফিরে যেতে চায় তার জায়গায়। তাগাদা দেয় বাপকে। পা বেরবার আছে বলে দিক তাকে।

দিনের বেলা সব কথা বলা চলে না। চিরদিনের সাবধানী সন্দিগ্ধ মন জয়দেবের। দ্বিতীয় কানের কারবার সে করে না কোনও দিনও। তাই রাত একটু গভীর হ'লে শুকদেবকে টেনে নিয়ে আসে তেতুল বট তলায়। বলে তার মতলবের কথা। শুনে একরকম লাফিয়েই ওঠে শুকদেব—"মাথা খারাপ, না মাতাল! আমরা বামুন আর ওরা—"

"থাম্ বাপু," ধমকানি দেয় জয়দেব, "আগে শোন সব। ওরা এখনও জানেনা যে আমরা বামন। কাবলীকে বলতে বারণ ক'রে দিয়েছি প্রথমেই। বৌমাকেও বারণ ক'রে দিবি।"

"কেন?"

"নয়ত' কি বামুন জান'লে ওরা আর এখানে থাকতে দিত আমাদের? কখন কোথায় ছোঁয়াছুঁয়ি হ'য়ে যায় সেই ভয়েই দিত তাড়িয়ে। এমন বিনিভাড়ার ঘর—"

"তা কি করবে এখন ?"

"তাই বলতেইতো তোকে ডাকলাম।"

চলতে থাকে পরামর্শ। অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে সেই তেঁতুল-বটের নিচে। তারই আবরণের আড়ালে অবস্থিত দু'বাপ-বেটায় যুক্তি করতে থাকে কি উপায়ে উৎখাত করা যায় একটি নিরীহ সংসারকে। না ক'রে পাওয়ার লোভ যেমন তীব্র তেমনি পথও তার বঙ্কিম।

পরামর্শের পর কাজে নামতে আর বিশেষ দেরি হয়না। পরদিন থেকেই দেখা যায় শুকদেব অত্যন্ত বাধ্য হ'য়ে পড়েছে হরিদাসীর। নতুন পাওয়া মাসীমাকে কি ক'রে খুশি করবে সেই চিন্তাতেই অস্থির। ঘুরে ফিরেই জিজ্ঞাসা করে 'এটা করব মাসীমা' 'ওটা করব মাসীমা'। যেন মাসামার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কাজ করা তার সাধ্যাতীত। সে শিক্ষাই তার নয় যেন।

এক এক ক'রে কয়েকটা দিন চলে যায় মাসীমা তোষণে। তারপরই একদিন দেখা যায় হরিদাসী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পবনকে দিয়ে কয়টি খুঁটি গাড়িয়ে নিচ্ছে চালাঘরের একপাশে। কাবলী বের হয় না ঘর থেকে। যে ক্ষ্যাপা মানুষ পবন, হয়ত' হাত চেপে ধরে টানাটানি শুরু করবে বিয়ের বায়না তুলে। শুধু জয়দেব বেরিয়ে আসে ঘরের ভিতর থেকে।

"এটা আবার কি হচ্ছে ?" না জানার ভান তার।

"ছেলেটা এল, তার একটা খোপ না ক'রে দিলে থাকে কোথায় ?" উত্তর দেয় হরিদাসী।

"আবার কতকগুলো খরচের পাল্লা! কি যে এমন দরকার ছিল! আজ এখানে আছে, কালই হয়ত' কাকদ্বীপে চলে যাবে।"

"না, না, যাবেনা," হরিদাসীর গলার স্বর সহানুভূতিতে ভরা, "এইত' কালই বলছিল, এখানে একটু মাথা গুঁজবার জায়গা

পেলে কোর্টের ওখানে একটা পানের দোকান দেবে। গাঁয়ের মানুষ সব আসেত', পান বিক্রী হয় খুব।"

খুঁটি গাড়া চলেছে, এমন সময় কতকগুলো কেনেস্তারা টিন মাথায় ক'রে এসে উপস্থিত হয় শুকদেব। কাটা টিন। ঘর ছাইবার উপযুক্ত। বাণ্ডিলটা ঝপাং ক'রে ফেলেই বলে ওঠে সে, "ওটা আবার কি হচ্ছে মাসী?"

"একটা খোপ ক'রে দি' তোমার।"

আর বলতে হয়না মাসীকে। একরকম চেঁচিয়েই ওঠে শুকদেব, "তুমি কি তাড়াতে চাও আমাদের মাসী? তা বললেই হয় মুখ ফুটে। আমি কোথায় মাথায় ক'রে টিন বয়ে নিয়ে এলাম তোমার ঢেঁকি ঘরটার একটা চালা ক'রে দেব বলে—"

"যে না নিকে, তার চিত্তির আর বাত্তি," তিড়বিড়িয়ে ওঠে হরিদাসী, "যে আমার ঢেঁকিশাল, তার আবার মাথায় চাল! থাক্, ও টিন তোমার মাথাতেই উঠবে।"

ওঠেও তাই। পাকাপোক্ত হয়ে বসে শুকদেব। বসিয়ে দেয় হরিদাসী। নিজের হাতেই নিজের উচ্ছেদের বীজ বোনে।

শুকদেবের পরবর্তী কাজ হচ্ছে হরিদাসীর কাছে পরানের বিয়ের কথাটা পাড়া। হাতের কাছেই যখন পাত্রী রয়েছে তখন ছেলেটার মনের সাধ না মেটাবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না হরিদাসী। সাধ থাকলেও সাহস ক'রে সেকথা বলতে পারে না সে। কিন্তু এখন যখন রাস্তা খুলে দিয়েছে শুকদেব তখন তাকে অবলম্বন করে এগুতে ক্ষতি কি? লোভও আছে তার কাবলীর ওপরে। চৌকস মেয়ে। কাজেকর্মে কথাবার্তায় ঘরে তুলবার মতই মেয়ে বটে। একটু তাড়াতাড়িই এগিয়ে যেতে চায় হরিদাসী। কিন্তু এগুতে গিয়ে দেখে কেমন যেন পিছলে যায় শুকদেব। হাতের কাছে থেকেও সে অধরাই থেকে যায়।

অপেক্ষারও একটা সীমা আছে। অধৈর্য হয়ে ওঠে হরিদাসী। শেষে একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে বসে শুকদেবকে, "বিয়ে যদি না দিতে চাও তাহ'লে খোলাখুলি বলে দাও বাপু। আইবুড়ো মেয়ে চোখের ওপরে ঘোরাঘুরি করবে, দেখে কোন ছেলের মন ভাল লাগে?"

"সত্যি কথাইত'" হরিদাসীর কথাতেই সায় দেয় শুকদেব, "আমিওত' সেই কথাই বলছি কাবলীকে। কিন্তু ছুঁড়ির এক গোঁ—লোকে বিয়েতে কত কি পায়, আমি কি পাব শুনি?"

"কেন, এ সবইত' তারই হবে। পর না আমার একটাই মাত্তর ছেলে।"

"বললামত' সে কথা। তা বলে যে বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, কখন কার কাছে বেচে বসবে জমি আর আমাকে গিয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে। ও আমি পারব না বাপু। তাই বলছিলাম মাসী, অমত যখন কারও নেই, তখন এর একটা বিহিত তুমিই কর।" অতি নম্রভাবে মাসীর কাঁধের ওপরেই বোঝাটা চাপিয়ে দেয় শুকদেব।

"বেশ কথা, দেখি ভেবে চিন্তে কি করা যায়," বলে থেমে যায় হরিদাসী। থামে বটে কিন্তু বাইরে থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় মাসীর মস্তিষ্কে চিন্তা-কীটটা রেশম কীটের মত সূত্র প্রসব করে পাকিয়ে চলেছে। কথা বাড়ায়না আর শুকদেব। অপেক্ষায় থাকে মাসীর বিহিতের উপায় উদ্ভাবনের।

অপেক্ষাও বিশেষ করতে হয়না। পরদিনই মাসীর ডাকে শুকদেব চলতে থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে। পথে না ওঠা পর্যন্ত কোন কথা নয়। বড় রাস্তায় উঠেই জিজ্ঞাসা করে শুকদেব, "কোথায় যাচ্ছ মাসী?"

"ভাল উকিল জানা আছে তোমার?" জিজ্ঞাসা করে হরিদাসী।

"সেই কথার উত্তরেই শুকদেব হরিদাসীকে নিয়ে আসে আমার কাছে," বলতে থাকে নীরোদ সামন্ত।

কোর্ট এলাকার ধারে কাছেও নয়। একেবারে গঙ্গার ধারে এসে আলোচনায় বসে তারা। শুকদেব, হরিদাসী আর নীরোদ সামন্ত। কিন্তু আলোচনার মুখবন্ধেই থমকে যায় হরিদাসী। সে তার জমি কাবলীর নামে উইল ক'রে দেবে। বিক্রী-কবালাও নয়, শুকদেবের নামেও নয়। গঙ্গার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবতে থাকে শুকদেব, ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গার জল শুধু কর্দমময়ই নয়, লবণাক্তও বটে। এর থেকে সাদা এবং লবণের অংশ বাদ দিতে অনেক কাঠ খড়ই পোড়াতে হবে তাকে।

মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে আবার বেরুতে হয় কাবলীকে। বাবার বকুনি, দাদার ধমকানি। যেতে হয় পুকুরে। কোর্টের সামনেই সংরক্ষিত পুকুর। শুধু খাবার জল নেবার ব্যবস্থা। সেখান থেকে জল আনতে যেতে হয়। অনেকটা পথ। কোমর ধরে আসে কাবলীর। দাঁতে ঠোঁট টিপে এগুতে থাকে সে। মনের ভেতর আগুনের জ্বালা। বুঝতে পারে বাবা আর দাদা তাকে নিয়ে কি এক কঠিন খেলায় মেতেছে। কিন্তু কি সে খেলা তাই জানতে না পারায় প্রতিবাদ করবার কোন রাস্তাই খুঁজে পায়না।

[illegible] একটু চড়াতে না চড়াতেই বেরিয়ে যায় শুকদেব। গাঁয়ের মানুষ আসে মামলা লড়তে। তাদের উকিলের ব্যবস্থা করে দেয় সে। দালালি কাজ। ব্যবস্থা আছে উকিলের সঙ্গে। সুযোগ বুঝলে এপক্ষ থেকেও একটু বসিয়ে নেয়। ব্যস্ত মানুষ। বাড়ি এসে খেয়ে যাওয়ারও সময় নেই তার। তাই দুপুরের খাবার কাবলীকেই নিয়ে যেতে হয় কোর্টে। শুকদেবের অনুপস্থিতির সুযোগ পেয়ে সঙ্গ নেয় পবন।

"আমাকে দাও না। তোমার হাত লেগে যাচ্ছে যে।"

কাবলীর পরিশ্রম ব্যথা জাগায় পবনের মনে। তার হ'য়ে নিজেও সে কিছু করতে চায়। উত্তর দেয় না কাবলী। যেটুকু প্রশ্রয় দিয়েছে মনের ভুলে তারই জের টানতে সে জেরবার। এরপর আবার সেই কাদা ঘাঁটতে রাজি নয় সে।

কাবলী রাজি না হ'লে কি হয়, পবনেরও যে উপায় নেই। শুভ্র মনের পাতায় যে দাগ পড়েছে তা আর কিছুতেই পারে না সে মুছে ফেলতে। মার বকুনিতেও নয়, শুকদেবের চোখ রাঙানিতেও নয়। প্রথমেই ধরা চড়া সুর, কিছুতেই পারছেনা সে খাদে নেমে আসতে।

ছেলেব অবস্থা দেখে গোপনে চোখের জল ফেলে হরিদাসী। তবুও মেনে নিতে পারেনা শুকদেবের কথা। ভাবা পুত্রবধূর নামে জমি লেখাপড়া ক'রে দেবে, তার ভেতরে বিক্রী-কবালাই বা আসে কিসে আর শুকদেব জয়দেবই বা আসে কেন? সন্দেহ-জাগা মনে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে সে। মন থেকে একরকম মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছে ছেলের বিয়ে দেওয়াব আশা। অবুঝ পবন। জীবনটা সমান্তরাল সড়ক তার কাছে। চোরাগলির কোন খোঁজই রাখেনা। ঘুরে ফিরেই খোঁজায় তাব মাকে, "বিয়ে দিবিনে মা?" দিনের পর দিন ছেলের এই একই বায়না। শেষে একদিন রাগ করেই হরিদাসী সব কথা শোনায় তাকে। হাঁ ক'রে সবটুকুই শোনে পবন। কিসে কি হয় তা বোঝবার ক্ষমতা নেই তার। শুধু এইটুকুই বুঝে পেয়েছিল যে ওরাও জমি চায় নইলে বিয়ে দেবে না। চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে সে, জমি ভাগ করবে কি ক'রে? মাথায় চিন্তার ভার, এলোমেলো ঘুরতে থাকে রাস্তায় রাস্তায়। তারপর একদিন হঠাৎ পায়ের নিচে মাটি মেলে তার। দেখে আসে মিত্তিরবাড়ির বড়বাবু ঘুরে ঘুরে মালিকে দেখাচ্ছেন বাগানের কতটা জায়গায় কি কি করতে হবে। জমি ভাগ করবার হিসেবই

যদি মিলে গেল তাহলে আর বিয়ে করবার বাধাটা কোথায়? পড়ি কি মরি ক'রে ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসে সে।

সিদ্ধ ধান রোদে মেলে নেড়ে দিচ্ছিল তখন হরিদাসী। এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে তার হাত ধরে টানতে থাকে পবন।

"ওঠ্ না মা, ওঠ্।"

"বল্‌না।" উঠতে চায়না হরিদাসী।

"তুই ওঠ্ আগে।"

ছেলের টানে বাধ্য হয়েই উঠতে হয় হরিদাসীকে

"বল্।"

"এই দেখ" বলে জমিটার ওপরে মিত্তিরবাড়ির বড়বাবুর মত ঘুরে ঘুরে ভাগ ক'রে দেয় পবন, "এইটুকুন্ আমাদের," আবার কিছুটা ঘুরে আসে, "এইটুকুন্ শুকদেবদার আর ঐ টুকুন্" বলে হাতের ইসারায় বাকা জমিটা দেখিয়ে দিয়েই লজ্জায় পড়ে যায় সে।

"ওটুকু কার?" কঠিন হ'য়ে উঠেছে হরিদাসীর গলার স্বর।

"ধ্যেৎ লজ্জা করে।" ফাঁকি দিয়ে কথাটা বলেই মাথাটা ঝুঁকে পড়ে পবনের। পায়ের গোড়ালির আঘাতের ছোট্ট একটা মার্বেল খেলবার গাববু তৈরী ক'রে তার ভেতরে গোড়ালি রেখে বোঁ ক'রে একটা পাক খায় সে।

"ওরে হ'তভাগা, মরবি যে," কাত্‌রে ওঠে হরিদাসী।

"যাঃ, বিয়ে করলে বুঝি মরে?" মায়ের কাথাটার সহজ অর্থটাই বোঝে সে, "ঐ যে মাষ্টার বিয়ে করল, ও বুঝি মরেছে?"

ছেলের রকম দেখে চিন্তায় পড়ে যায় হরিদাসী। বয়স হ'য়েছে ছেলের। বিয়ে করবে বলে পাগল হয়ে উঠেছে। এখন বিয়ে না দিলে কি কীর্ত্তিকাণ্ড করে বসবে তারই বা ঠিক কি? চিন্তিত মনেই সে আবার গিয়ে বসে ধান নেড়ে দিতে। বসেই শুধু। হাত চলেনা। ভাবনার স্রোত বয়ে চলেছে মাথার ভেতরে।

কাবলী সম্বন্ধে এতটুকু আপত্তি করবার কিছু নেই তার। বরঞ্চ ঐ রকম একটি বউই সে চায়। যে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ছেলেটাকে। কিন্তু তার নামেই কে কিছু দিতে পারছে না সে। অবশ্য একফালি জমি থেকে যাচ্ছে নিজেদের। ঢেঁকিটাকে আর একটু সরিয়ে নিয়ে চালার এপাশটায় আর একটা খোপ বানিয়ে নিলেই চলে যাবে। তাহ'লে তাই করা যাক্। মনস্থির ক'রে ফেলে হরিদাসী। "চল্ দেখি, যাই আবার—" বলে উঠে দাঁড়াতেই দেখে পবনের ঘাড় ধরে চালার ভেতর থেকে বের ক'রে দিচ্ছে জয়দেব। কখন গিয়ে ঢুকেছে ওদের খোপে কে জানে।

"কি কি, হয়েছে কি ?" ছুটে যায় হরিদাসী।

"কথা নেই, বার্ত্তা নেই, যখন তখন ঘরের ভেতরে এসে ঢোকে কেন ?" দাঁতে দাঁত চেপে পাশের খোপে কাবলীর কান এড়িয়ে বলে জয়দেব, "আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে না ঘরে ?"

"কেন যাস, কেন যাস হতভাগা মরতে ?" অসহায় ক্রোধের সব খানিই এসে প্রকাশ পায় পবনের পিঠের ওপরে। সাধ কি শুধু পবনের একার ? তারও কি নেই ? কিন্তু এই আড়কাঠি দুটিকে ডিঙিয়ে একপাও এগুবার রাস্তা নেই যে তার। জ্বলে পুড়ে মরছিল সে নিজের অন্তরেই, তার ওপরে ছেলের এই অপমান! কিছু না করতে পারার সেই জ্বালাটিই কিল হয়ে প্রকাশ পায় পবনের পিঠের ওপরে। তারপরই ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে সদর রাস্তা ধরে। আজ সে দেখিয়ে দেবে কার গায়ে হাত দিয়েছে ঐ বুড়ো।

•

"উপায় ছিল না সার, তাই জমিটাকে চার ভাগ করতে হল," বলতে থাকে নীরোদ উকিল, "পবনের হাত ধরে টানতে টানতে একবারে কোর্ট এলাকায় এসে হাজির। আমি তখন কোর্টঘর থেকে বেরুচ্ছি। দেখি, ওরা শুকদেবকে খুঁজছে। বুঝলাম

ব্যাপার। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমিও খুঁজতে আরম্ভ করি। পাওয়াও গেল তাকে। টেনে নিয়ে গেলাম গঙ্গার ধারে। কথাবার্তাও হল। কিন্তু বুঝছেনত' সার, আমারও একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই করবার দরকার। তাই জমিটাকে চারভাগ ক'রে একভাগ ওদের রেখে বাকী তিন ভাগের বিক্রয়-কবালা করা হ'ল জয়দেব, শুকদেব আর কাবলী সাঁপুইএর নামে।"

"সাঁপুই কোথায়, ওরাত' বামুন! আর কাবলীর নামে কোন দলিল দেখলামনাত'?" প্রশ্ন করেন মহিমবাবু।

"হরিদাসী যদি জানত যে ওরা বামুন তাহ'লে কি আর এত কাণ্ড হ'ত? ওকে বলা হয়েছিল যে শুকদেবরা সাঁপুই। তাইত' এতটা এগিয়েছে সে। দলিলের মুসাবিদা করে দিই আমি আর লিখে দেয় একজন মুহুরী। পড়েও শোনাই আমিই। পড়বার সময় আমার নামের বদলে কাবলীর নাম পড়ে যাই। তাতেই সন্তুষ্ট ও," বলে নিজের কৃতিত্বে হে হে ক'রে হাসতে থাকে নীরোদ সামন্ত। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মহিমবাবুর মনে হয় একটা বীভৎস চেহারার জন্তু যেন দাঁত বের ক'রে গোঙরাচ্ছে তাঁর সামনে। মনুষ্যত্ব শব্দটিই এর অপরিচিত। আত্মস্বার্থের যপকাষ্ঠে ফেলে আপন সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে নির্মমভাবে বলি দিয়েছে সে।

"চলে যান," হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন মহিমবাবু, "চলে যান এখান থেকে। ঠক্, জোচ্চোর কোথাকার। হরনাথবাবু—"

চীৎকার শুনে ছুটে আসে হরনাথ। ভয়ে হাত পা কাঁপছে তার। কি বা বিশেষ দোষ ক'রে ফেলেছে সে। নাকি কেউ নালিশ ক'রেছে তার নামে? দু'চার পয়সা উপরি? সেত' সব বৈষ্ণবের একই কেত্তন। তার ভেতরে এমন কি অপরাধ খুঁজে পেলেন হুজুর! বুকের ভেতরে হাতুড়ির পিটুনি নিয়ে হুজুরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় হরনাথ।

"শুনুন," হরনাথ খাস কামরায় ঢুকতেই হুকুম জানান মহিমবাবু,

"এই নীরোদ সামন্ত যে দলিলে সই করবে, সেগুলো আলাদা ক'রে রাখবেন। আমি জেরা ক'রে সন্তুষ্ট হলে তবে সই করব," বলেই ফিরে তাকান নীরোদ উকিলের দিকে, "তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন ?"

"না সার, দাঁড়াবার কি আর উপায় আছে ? আচ্ছা সার, নমস্কার।"

হাসিমুখেই বেরিয়ে যায় নীরোদ উকিল। ভালভাবেই জানে সে—লজ্জা, মান আর ভয়, এই তিন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে আর যাই করা যাক্, আখের গুছোন যায় না।

মাথার ভেতরে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে নীরোদ উকিল দুটো দিনের সময়ের ব্যবধানেও তা স্তিমিত হয়ে আসেনা। এ যদি শুধু জয়দেবের ঘটনা হ'ত তাহলে হয়ত' এতখানি বিচলিত হয়ে উঠতেন না তিনি। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে নীরোদ উকিল, যে তাঁরই খাস-কামরায় এসে আড্ডা জমায়। ভয় তাঁর—ঘটনাটি যখন প্রকাশ পাবে তখন তাঁর উঁচু মাথা থাকবে কোথায় ? হরনাথকে বলে দিয়েছেন, তিনি না বলা পর্যন্ত তিনখানি দলিলের একখানিও যেন কপিয়িং ডিপার্টমেণ্টে না পাঠান হয়। কারণও ছিল কিছু। পবন বুদ্ধিহান, একথা প্রমাণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। এখন শুধু দেখতে হবে জমিটা শুদ্ধমাত্র হরিদাসীর নামেই ছিল, না পবনও তার একজন মালিক। দলিলে অবশ্য দু'জনেই টিপসই দিয়েছে। রাস্তা ঐ একটি মাত্রই দেখতে পান তিনি। সেক্শান ৩৫ এর ক্লজ ৩ (বি)। স্পষ্টই বলা আছে সেখানে, অপরিণত বয়স্ক, বুদ্ধিহীন অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক বিক্রেতা হ'লে হাকিম (Registering Officer) রেজিষ্ট্রী করতে অস্বীকার করতে পারেন। এই আইনেরই সাহায্য নেবেন মহিমবাবু। সই অবশ্য হয়ে গিয়েছে দলিলে। তা হ'ক, তার ওপরে লেখা থাকবে তাঁর মন্তব্য। অর্থাৎ বাতিল।

শুধু বাতিল নয়, চাকি শুদ্ধ বিসর্জন। পরের দিন শনিবারটা বাদ দিয়ে রবিবার সকালে নিজেই গিয়েছিলেন মহিমবাবু হরিদাসী গায়েনের বাড়ী। যে ভাবে হ'ক, এই দলিলের গোড়া মেরে আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে তাঁকে। ওরা জানেনা গোলামী কি জিনিষ। বদনামের কালি একবার গায়ে লাগলে অক্ষয় দাগ এঁকে রেখে যায় 'সি, সি, আর'এর পাতায় আর তার ফলভোগ করতে হয় সমস্তটা জীবন ধরে। না বুঝে যে পাপ করছেন নীরোদ উকিলকে খাস কামরায় ঢুকতে দিয়ে তার খেসারৎ গুণতে হচ্ছে এখন দৌড়ঝাঁপ করে। তা হ'ক, টেনে যদি তুলতে পারেন একবার কেসটাকে তাহ'লে লোকসানের অঙ্ক তার লাভের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে।

আশা এবং নিরাশার দোটানা দোদুল্যমান অবস্থা মনের। মহিমবাবু গিয়ে উপস্থিত হন হরিদাসীর বাড়ির সামনে। কাউ-কেই দেখা যাচ্ছে না। তবে কি কেউ নেই নাকি?

"হরিদাসী গায়েন আছো?" ডাক দেন মহিমবাবু। বলা যায় না, হয়ত' থাকতেও পারে ঘরের ভেতর

ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হরিদাসী মুখ চোখ ফোলা। উস্কো খুস্কো চেহারা দেখে মনে হয় যেন ঝড়ের এক প্রবল ঝাপটা চলে গিয়েছে ওর দেহের ওপর দিয়ে। মহিমবাবুকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় হরিদাসী, তারপরই ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে এসে আছড়ে পড়ে তার পায়ের কাছে। কান্নার বেগে ভাষা গিয়েছে তার হারিয়ে। শুধুই মাথা কুটতে থাকে মাটিতে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু। হতবাক্, ব্যথিত অন্তর। বুঝতে পারেন না, এ তার প্রার্থনা, না প্রায়শ্চিত্ত। কেন সে এমন ক'রে নিপীড়ন করছে নিজেকে। একবার অন্য ঘরগুলির দিকে তাকান তিনি। দেখতে পান না জনপ্রাণীকেও। দেখা না গেলেও বুঝতে পারেন অধিবাসীরা আছে সেখানে এবং বিশেষ উৎকর্ণ

হ'য়েই। কি কথা হয় তাঁর হরিদাসীর সঙ্গে তা জানা তাদের বিশেষ প্রয়োজন।

"শোন, আগে উঠে দাঁড়াও, শুনি তোমার কি হ'য়েছে," একটু কড়াস্বরেই হুকুম করেন তিনি, নইলে মাথাকোটা থামাবেনা ও।

"আমার সব্বোনাশ হ'য়ে গিয়েছে হুজুর, পথে বসেছি আমি," কোন রকমে কথা কয়টি বলেই দ্বিগুণ জোরে মাথা কুটতে থাকে হরিদাসী।

"আঃ, বললে শোনে না।" ধমক দিয়ে ওঠেন মহিমবাবু, "ওঠ, উঠে দাঁড়াও।"

হুকুমের জোরেই হ'ক অথবা হুজুরের হস্তক্ষেপের আশাতেই হ'ক উঠে দাঁড়ায় হরিদাসী। মাটির প্রলেপ লেগেছে কপালে মুখে গালে। তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে চোখের জল। যেন মাটির বুকে নতুন পথের সৃষ্টি ক'রে চলেছে ফুলে ফেঁপে ওঠা নদী।

"হ্যাঁ, কি হ'য়েছে এবার বল দেখি।"

বলতে যায় হরিদাসী, বলতে চায়ও সে। কিন্তু পারে না। অপমান আর বঞ্চনা, দুয়ে মিলে যে আঘাত দিয়েছে তার অন্তরে তারই ব্যথার প্রাবল্য ভাষা-পথ রোধ ক'রে দিয়েছে তার। তারই ভেতর থেকে থেমে থেমে একটু একটু ক'রে যা বলে হরিদাসী তা শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মহিমবাবু। একি জীবনের পথ, না মরণের ফাঁদের দিকে পা বাড়াল কাবলী? আপন অন্তর দিয়েই বুঝতে পারেন তিনি মনুষ্যত্বের এই অবমাননা সহ্য ক'রতে পারেনি সে। বিয়ে যেখানে হবেনা, হ'তে পারেনা, সেইখানেই তাকে বেঁধে দেবার লোভ দেখিয়ে গরীব গৃহস্থের সামান্য জমিটুকু বিক্রী-কবালা ক'রে নেবার এই জঘন্যতাকে মেনে নিতে পারেনি সে তার শুচিশুদ্ধ অন্তর থেকে। তাই কাল এই ঘটনা শোনবার পর আজ সকাল থেকে আর দেখা যায়নি তাকে।

"আমার এই আগাছার জঙ্গলে ঐ একটিই ফুল ছিল হুজুর। আর সবত' বিষকাঁটা। এরা মানুষ না হুজুর, এরা শয়তান—" বলতে বলতে আবার হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে হরিদাসী, "আমার পবনাটাকে ওরাই শেষ ক'রে দিল হুজুর। সেই সকাল থেকে শুধু রাস্তায় রাস্তায় ছুটে বেড়াচ্ছে মেয়েটার খোঁজে।"

বিস্ময়ের ঢেউ একটির পর একটি এসে আছড়ে পড়ছে মনের অঙ্গনে। স্তব্ধ গৃহবাসী সেই বিচিত্র বীচিমালা দর্শণে। তার ভেতর থেকে শুধু একটি কথাই বার বার করাঘাত হানতে থাকে রুদ্ধ প্রকোষ্ঠের দরজায়—মানব চরিত্রের কত দিকই না অদেখা থেকে যায় মানুষের। আপাতঃ দৃষ্টিতে যা মনে হয় অপাংক্তেয়, শুদ্ধ চোখের দৃষ্টিতে তাই হয়ত' মনে হবে অপরূপ। মনের কোনে একটু ব্যথাও অনুভব করেন কাবলার জন্যে। তিনি ত' জানেন অরণ্যের চাইতে জনারণ্য আরও কত ভীষণ।

"তাহলে কি হবে হুজুর?" উন্মুখ দৃষ্টি হরিদাসীর।

"কাল একবার যেও তোমার ছেলেকে সঙ্গে করে। দেখি, যদি জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি তোমার।" সান্ত্বনা দেন মহিমবাবু।

"তাতে আর কি হবে হুজুর?" হরিদাসী বিশেষ খুশি হ'য়েছে বলে মনে হয়না, "মেয়েটাত' আর ফিরবে না।"

এরপর আর কোন কথাই চলে না। শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রতে হয় এই মহত্ত্বকে। রিক্তা হ'য়েও ঐশ্বর্যময়ী, কুরূপা হ'য়েও যার রূপের তুলনা নেই, পার্থিব দৃষ্টিতে অবলোকন করা যায় না তার সেই অপার্থিব রূপকে। তাই নির্বাক নির্মল দৃষ্টি মেলে এই হৃত-সর্বস্বা স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে তার সেই ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারটিই দেখতে চেষ্টা করেন মহিমবাবু।

কাবলী আর হরিদাসীর এই ঘটনার পরে ডায়মণ্ড হারবারে

আর মন বসেনি মহিমবাবুর। কেমন একটা তিক্ততা এসে গিয়েছিল। শহীদান আর কাদেরের ভালবাসায় যে বুক ভরে গিয়েছিল তাঁর, সেই ভরাট বুকখানা খালি হ'য়ে যায় এই প্রবঞ্চিতা তুইটি নারীর ব্যথায়। পবনেরও মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। চোখ তুটি সর্বদাই কিসের অন্বেষণে রত। আর থেকে থেকে চীৎকার ক'রে ওঠে "কাবলী, কাবলী—"

বিক্ষিপ্ত মন। সংসার সম্বন্ধেও কিছুটা উদাসীনতা এসে গিয়েছে। ভাঙ্গা আসর মাঝে মাঝে জমাতে আসেন লক্ষ্মীদেবী। জমে না। যেদিন থেকে তাঁর মুখে বুলি ফুটেছে সেদিন থেকেই একটু একটু ক'রে দূরে সরে গিয়েছেন মহিমবাবু। ফুলের বাগান নিয়ে মেতে থাকবার চেষ্টা করেছিলেন কিছুদিন। ফল পাননি সেরকম। অশিক্ষিতের কাছে শিক্ষালাভ করা ছাত্রের মত কুঁকড়ে গিয়েছিল গাছগুলো। হতাশ হয়ে সে চেষ্টা ত্যাগ করে বই নিয়ে লেগে পড়েছিলেন। কাজের সময় কাজ। অবশিষ্ট সময় বই। গণ্ডী কেটে নিলেন জীবনে। আর এরই ভেতরে রেজিষ্ট্রার অথবা ইন্‌স্‌পেক্‌টার এলে তাঁকে ধরতেন বদলির জন্য। বাঁধা বুলি তাঁদের—আচ্ছা দেখি। সে দেখা যে কি রকম তা ভালভাবেই জানেন তিনি। তবুও চেষ্টা করতে হয়। তাই করতে থাকেন তিনি। এবং তার ফলও ফলে একদিন। দীর্ঘ কয়টি বৎসর এই একই জায়গায় ঘুঁটি আগলে বসে থাকবার পর গা-নাড়া দেবার হুকুম আসে ওপর থেকে। চব্বিশ-পরগণার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে যশোহরের কোর্ট-চাঁদপুর। ঠিক কোর্ট-চাঁদপুর নয়, কয়েক মাইল দূরে খালিশপুর। যে পুরই হক, হারবারহীন এই ডায়মণ্ড হারবারে যে আর নয় তাতেই খুশি তিনি। বদলি হাকিমও চলে এলেন। কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা এবারের। একে একে অনেকেই আসছে দেখা করে যেতে। সস্ত্রীক অনুরূপবাবু এসেছিলেম। অনেকক্ষণ থেকে গল্প গুজব করে গিয়েছেন। যাওয়ার কথা শুনে

বাড়িতে যাওয়ার নাম করে টাকা পয়সা মিটিয়ে নিয়ে আগেই পালিয়েছে টেনু। নাত্‌নীরামকে সত্যিই ভালবেসেছিল সে। যদিও তার 'টেনুবাবু' ডাক শুনে অনেকদিন খুন্তি হাতে নিয়ে ধাওয়া করেছে সে আর সু-উচ্চ ভুঁড়িটাকে পুরী-সমুদ্রের বুকে নৌকোর মত ওলট পালট করা দোল খাইয়ে ছুটে পালিয়েছে নাত্‌নীরাম।

লোকমুখে সংবাদ পেয়ে যাত্রার দিন সকালেই এসে উপস্থিত হয় কাদের আর শহীদান। পবিপূর্ণ অন্তরের চিহ্ন দু'জনার চোখে মুখে। ওদের দু'জনাব দিকে তাকিয়ে আবার একবার হাসেন মহিমবাবু। কাদেরও হাসে। হাসতে চেষ্টা করেও পারে না শহীদান। চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠেছে তার। ওদিকে লক্ষ্মীদেবী ব্যস্ত মালপত্র নিয়ে। কুলিরা সে সব নিয়ে যাচ্ছে স্টেশনে। নাতনী-রাম পাহারাদাব সেখানে। তারই মাঝে একবার এসে দাঁড়ান তিনি ওদের সামনে।

"চললাম গো। অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম তোমাদের।"

"কষ্ট কিছু দিলে খুশি হতাম মা," উত্তর দেয় শহীদান, "তবু ভাবতে পারতাম, যা পেয়েছি তার কিছু উসুল দিয়েছি।"

সে কথা শুনবাব সময় নেই লক্ষ্মীদেবীর। ব্যস্ত হয়ে পড়েন আপন কাজে।

যাত্রার সময় শহীদানেরাও সঙ্গ নেয়। কাদের কাঁধে তুলে নেয় খোকনকে। এগিয়ে চলতে থাকে দল।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে যান মহিমবাবু। পবন দাঁড়িয়ে। রুক্ষ কেশ, শতছিন্ন বস্ত্র পরিহিত বিষাদময় মূর্ত্তিখানি দেখেই চম্‌কে ওঠেন তিনি। আপন মনে বলে চলেছে, "মা গো মা, বিয়ে দিলি না: রেলগাড়ি চড়ে চলে যাব, দেখতে পাবি না।"

এক মুহূর্ত্তমাত্র। তারপরই দ্বিগুণ জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে যান তিনি সকলকে পিছনে ফেলে।

মাঝদিয়া স্টেশন থেকে তেইশ মাইল রাস্তা খালিশপুর। সহজতম পথ এইটিই। ভয় দাঁড়িয়ে নেই এর রাস্তার মোড়ে মোড়ে, ঝোপে ঝাড়ে। কিন্তু ভাবনা আছে। আপন দেহের হাড়ের কাঠামোটা ঠিক থাকা নিয়েই সেটা জাগে বেশি। তৈল কোম্পানী-গুলি অনেক তেল খয়রাত ক'রে বৃটিশ সরকারকে দিয়ে ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রধান রাস্তার নোয়া সোনা বাঁধিয়ে দিয়েছে। সে দৃষ্টি-প্রসাদ লাভ করেছে শুধু মোটরযানের অলঙ্কার-বহুল প্রধান সহরগুলি। দিবরাজপুর, খালিশপুর, কোর্ট-চাঁদপুরের কোমরে তখনও রূপোর গোট, পায়ে মল। চলতে ফিরতে হুম্‌হুমিয়ে ওঠে পাল্কীর বেহারা। ফোর্ডের বাড়ির হাল ফ্যাসানের চোখ ধাঁধানো আভিজাত্যের অলঙ্কার তাদের কল্পনারও বাইরে। ব্যবসা মানে খয়রাতি নয়, পরোপকারও নয়, স্রেফ আত্মচিন্তা। অর্থজগতের সন্ন্যাস-রূপ। আপন আত্মা নিয়েই বিভোর। তৈলকেন্দ্রের এই সন্ন্যাসিরা চিন্তাও করতে পারেনি খালিশপুর, দিবরাজপুরের কথা। ফলে গরীব গৃহস্থ ঘরের একমাত্র এয়োতীর চিহ্ন এই নোয়া ক্ষয়ে ক্ষয়ে যখন তুবড়ে যায়, দু'ঝুড়ি মাটি ফেলে ইউনিয়ন বোর্ড তাকে পিটিয়ে সোজা ক'রে দিয়ে বলে—ছোট ঘরে উঁচু নজর ভাল নয়। যা হ'ল, এই নিয়েই খুশি থাক। এই তেইশ মাইল পথও সেই পিটানো নোয়া।

বিমান চলাচলের পথে কখন কখন পাওয়া যায় 'এয়ার পকেট'। বায়ুশূন্য স্থান। ঝপ্‌ ক'রে নেমে যায় বিমান হাজার দু'হাজার ফুট নীচে, আরোহীদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে। তেমনি পকেটের অন্ত নেই এ রাস্তায়। টাল খাওয়া চাকা এঁকে বেঁকে চলার মাঝে ঘটাং ঘটাং ক'রে পকেটস্থ হওয়ায় কশেরুকার গ্রন্থিগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেতে চায়। মাঝে মাঝে ককিয়ে উঠছিলেন লক্ষ্মীদেবী। এইসব তুচ্ছ ব্যাপারের দিকে নজর দেবার মত যথেষ্ট সময় পায়না খোকন। ডায়মণ্ড-হারবার থেকে কলকাতা, এই সাঁইত্রিশ মাইল যাত্রাপথে

যে চুবড়িটি খালি ক'রে ফেলেছিল সে, সেটি আবার বোঝাই ক'রে নেওয়া হয় ক'লকাতায়, নতুনতর খাদ্যে। সেদিকে মনোনিবেশ করতে গিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করবার ফুরসৎ জুটছিল তার খুবই কম। একমাত্র মহিমবাবুর মনেই ঘুরে ফিরে জেগে উঠছিল কয়টি মানুষের স্মৃতি। যারা আপন আপন বৈশিষ্টে বিশিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল তাঁর চোখে। আর তার সঙ্গে একটি ব্যথাকাতর মুখ। আসবার সময় দেখেছিলেন ডায়মণ্ড-হারবার স্টেশনে। আপন মনে বলে চলেছিল···মাগো মা, বিয়ে দিলি না, রেলগাড়ি চড়ে চ'লে যাব, দেখতে পাবি না।

স্মৃতির জলাধার যত গভীরই হ'ক ইচ্ছামত সময় ডুবে থাকা যায় না সেখানে। বাস্তবের বঁড়শি টেনে তুলবেই তাকে। টেনে তোলে মহিমবাবুকেও। কে একজন লাফিয়ে ওঠে গাড়ির পা-দানির ওপরে। অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত না করেই বলে—"আগের হাকিমসাহেবত' এখনও যান নাই হুজুর, তাই আপনার থাকবার জন্যি আলাদা বাড়ি ঠিক করতি হ'ল। কোন কষ্ট হবিনে হুজুর। সমস্ত ঠিক ক'রে রাখিছি। মায়, চ্যালা কাঠ পর্যন্ত।"

"এটা কোন গ্রাম ?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"আজ্ঞে দিবরাজপুর হুজুর," উত্তর দেয় লোকটি, "খালিশপুর ইখান থিকে মাইল খানেকের একটু বেশি।"

"আপনি কি সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে কাজ করেন ?" আবার জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"আজ্ঞে না।" বলে আপন পরিচয় দেয় লোকটি। তার নাম অনাথ ঘোষ। বড়বাবু অর্থাৎ খালিশপুরের ওধারে কাঞ্চনপুরের চৌধুরীবাড়ির বড় তরফের অধীনে কাজ করে। এদিকের সমস্ত-কিছু তার নখদর্পণে। পথ চলতে চলতেই দেখিয়ে দেয় দিবরাজ-পুরের সবচেয়ে বড় জোতদার বড়মিঞা অর্থাৎ ওয়ালেৎ হোসেনের

বাড়ি। বড়মিঞার পরেই হচ্ছে ছেরু মিঞা। হাটের ওপরে বড় তুটো দোকান। একটা বাঁধাই কারবারের আর একটা মুদিখানা। তা ছাড়া আছে একলপ্ত প্রায় তিনশ' বিঘে জমি। কুমার নদীর পাড়েই বলতে গেলে। বর্ষার জলে পলি ফেলে দিয়ে যায় কুমার সেই জমির ওপরে। আর চৈতালি ফসল যা ওঠে—মা ধরিত্রী যেন তু'হাত ভরে তুলে দেন ছেরুমিঞার গোলায়। তবে যতই করুক এরা, আসলে 'ক' অক্ষর গো-মাংস। একটা পাঠশালা মত আছে, তাতে বছরের পর বছর প্রথম ভাগই পড়ান হয়।

"সেটা কি রকম?" মানুষটার শেষ কথাটা ঠিক ধরতে পারেন না মহিমবাবু।

"পাঠশালাই কন আর মক্তবই কন, পড়াতেত' ঐ এক পুঁচকে ছোঁড়া," বুঝিয়ে বলতে থাকে অনাথ ঘোষ, "তারও আবার শতেক ধান্ধা। তাই মক্তব খুলে বসবার ঠিক নাই কিছু। তেমনি জুটিছে ছাত্রগুলোন্। বতরে বতরে পড়া। ধান বোনা, ধান কাটা, চোতেলি ফসল কাটা, বর্ষার পর পাট পচানো, পাটের আঁশ ছাড়ানো, এই সব কর্ম্ম সারে যে সোময়টুকু থাকে সেইটুকুই ওদের পড়াশুনার বতর।. থাইলে কিসের উপর কি দাঁড়ালো? এক বতরে আসে প্রথম ভাগের যেটুকু পড়ে গেল, পাটের আঁশের সঙ্গি সঙ্গি সেটুকুন্ও গেল খসে। ফিরে বতরে আসে আবার মৌলবীর চাঁটি আর গোড়ার পাতা।"

গাড়ির ভেতরে মুখে কাপড় চাপা দেন লক্ষ্মীদেবী। আর প্রাণপণে ঠোঁটটিপে দমফাটা হাসির দম আটকে রাখেন মহিমবাবু। লোকটির রসিয়ে বলবার ক্ষমতা আছে বেশ। তার ওপরে যশুরে টান। মন্দ লাগে না শুনতে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছেন তিনি। অনাথ ঘোষ অনর্গল বকে যেতে পারে। কিন্তু তার বকবকানি দিয়ে বিরক্তিকর এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে না সে।

কথার ব্যঞ্জনে তার নিজস্ব একটি মশ্‌লা আছে যা উপভোগ্য করে তোলে ঐ ব্যঞ্জনকে।

দিবারাজপুরের মাঠ পাড়ি দিয়ে খালিশপুরে ঢুকতেই অভ্যর্থনার বহর দেখে অবাক হ'য়ে যান মহিমবাবু। মনে মনে একটু হেসেও ফেলেন বুঝি। মনে পড়ে মহাকাব্যের দেশের মুনিঋষিদের কথা। চির-রিক্ত মানুষ, কিন্তু এমন কিছুর অধিকারী যার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম দেখাতে আনত হ'ত রাজন্যবর্গের শির। তেমনি এমন কিছু আছে তাঁরও অধিকারে যা এই গ্রামবাসীদের টেনে এনে দাঁড় করিয়েছে তাঁর চলার পথের দু'ধারে। সসম্ভ্রম নমস্কার জানায় তারা। তা দেখে টিপ্‌পনী কাটেন মহিমবাবু, "তোমাকে নয়, আমাকে নমস্কার করছে।"

"এঃ, যে আমার শুক্‌নো নমস্কার।" লক্ষ্মীদেবীর উত্তরটা উভয় পক্ষকেই আক্রমণ ক'রে হয়। কিন্তু উত্তরেরও যে প্রত্যুত্তর হয় তা প্রত্যক্ষ করতেও বিশেষ দেরি হয় না। বিরাট আকারের মর্তমান কলার ছড়া-শুদ্ধ একটি হাত এসে প্রবেশ করেছে গাড়ির ভেতরে।

"আমার বাগানের কলা হুজুর," বাইরে থেকে হাতের মালিকের স্বর শোনা যায়।

ছড়াটির দিকে একবার তাকিয়েই দৃষ্টিটা বাইরের দিকে মেলে দিয়ে বলেন মহিমবাবু, "শুক্‌নো নমস্কার মাখা যাবে কি এতে? ধরে নাও, লোকটির কষ্ট হচ্ছে।"

সে কষ্ট করতে হয় না লক্ষ্মীদেবীকে। হস্তধৃত পদার্থটি মুখের ভেতরে চালান ক'রে দিয়ে খোকনই চেপে ধরে ছড়াটি। সেদিকে তখন আর মন নেই মহিমবাবুর। ভেসে গিয়েছে সেটা দূরে ফেলে আসা আর একটি জায়গায়। শান্ত আবহাওয়া সেখানকারও। কিন্তু এখানকার মত নয়। এমন নিস্তব্ধ পরিবেশ দেখে মনেও হয় না এখানে আছে কোনও এজলাস, যেখানে ক্রেতা বিক্রেতা আর মুহুরীর হয় সমাবেশ।

কলসী কাঁখে, গামছা কাঁধে বৌ-ঝিরা চলেছে কুমার নদীর দিকে। পথের ধারে গাছের ছায়ায় পোঁতা কাঠিতে রং-ছোপান সুতোর টানা দিয়ে শুকিয়ে নিচ্ছে জোলারা। গ্রামের ছেলে মহিমবাবু। শিরা উপশিরা তাঁর সেই গ্রামের দেওয়া রসই বহন করে চলেছে। তবুও যেন ভুলে যেতে বসেছিলেন সে কথা। প্রবেশনের ক'বছর কেটেছিল কুষ্টিয়ায়। তারপর চাকদা আর ডায়মণ্ড-হারবার। গ্রাম্য চেহারার ওপরে ছিল তাদের সহুরে পোষাক। কিন্তু এর প্রতি অণু পরমাণু গ্রাম্য। সহর এখান থেকে প্রায় ষোল মাইলের ধাক্কা। বনগাঁ। নতুন করে গ্রামের সঙ্গে আবার পরিচয় হয় তাঁর।

ঝামেলা অনেক। প্রথমে ভেট গ্রহণ। কাকে খুশি করতে গিয়ে কার মুখ বেজার হবে সে এক ভয়। কাঞ্চনপুরের জোতদারদের বড় তরফ বাসুদেব চৌধুরীর তরফ থেকে এসেছে প্রায় পাঁচসের ওজনের এক বিরাট রুই। ছোট তরফের ভবদেব চৌধুরী পাঠিয়েছেন প্রায় আধসেরি ওজনের গোটা ছয়েক মাগুর। আর দিবরাজপুরের বড়মিঞার ভেট একটি কচি পাঁঠা। সোয়া-দুইজন মানুষের সংসারে এ যেন ছাগলের মুখে হাতির বোঁদলা। বিরাট একখণ্ড কলাগাছের খোলার ওপরে খড় পাকিয়ে এক বৃহদাকার জামবাট্টি তৈরী করা হয়েছে, আর তার ভেতরে দেওয়া হয়েছে সের পাঁচেক চাল। হাতির মুখের একটি গ্রাস। নাম 'বোঁদলা'।

ভেট গ্রহণের পর কার্যভার গ্রহণ। কাজের চাপ একটু বেশি যেখানে সেখানে দিনের কাজ দিনে সারা যায় না। অবসর সময়ের সুযোগের অপেক্ষায় ফেলে রাখতেই হয় কিছু। তাঁদেরত' আর 'please speak' লিখে ফাইলের বোঝা আপন মাথা থেকে সেক্শানের মাথায় তুলে দেবার সুযোগ নেই। ফলে সেখানেও সৃষ্টি হয় এক আবর্ত্তের। একজন কাজ বুঝিয়ে দেবেন না আজ,

আর একজনকে আজই কাজ বুঝে নিতে হবে। আপোষ নিষ্পত্তি করা এক দুরূহ ব্যাপার। চাকরীর স্বার্থ জড়িয়ে উভয়েই স্বার্থপর।

পরের ঝামেলাটি উট্‌কো। অজ পাড়াগাঁ। ছোট খাট ফৌজদারী কি দেওয়ানী মামলায় পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা। আর সাব-রেজিষ্ট্রার সাহেব হচ্ছেন এক্স-অফিসিও প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ। ফলে ছুটির দিনে পরিশ্রম বেশি। তবুও এর ভেতরে একটি আনন্দের রেশ খুঁজে পান তিনি। সে হচ্ছে গ্রামের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে মিশবার সুযোগ, হৃদয় দিয়ে চিনতে গ্রামের চরিত্রকে।

কার্যভার গ্রহণ করবার কয়েক দিন পরেই ডাক পড়ল এক সালিশি সভায়। বনমালী আর তফজ্জলের মামলা। ঘটনা যা ঘটেছিল বলে শোনা গেল তা হচ্ছে এই যে সাইকেল চড়া শিখছে বনমালী। তার দোকান ঘরের সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে সাইকেলের সিটের ওপরে বসলে একজন একটু ঠেলে দিচ্ছিল আর শক্ত মুঠোয় হ্যাণ্ডেল ধরে ঘটাং ঘটাং ক'রে অর্দ্ধেক পেডাল করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল সে, যত দূর পারে। তারপর একটু বাঁক নিতে হবে যেখানে সেইখানেই পড়ছিল গড়িয়ে। হাটবার। হাটুরেরা চলেছে হাটের পথ ধরে। আর সেই রাস্তার ধারের ফাঁকা জমিটার ওপরে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে হ্যাণ্ডেল ঠিক করতে প্রাণান্ত হচ্ছে বনমালী। ভারসাম্য বজায় রাখবার চেষ্টায় ব্যস্ত সে, মুখ তুলে তাকাবার অবসরটুকুও পাচ্ছে না।

খেয়াল নেই কখন ফাঁকা জমিটুকু ছাড়িয়ে রাস্তার গায়ে এসে পড়েছে। হঠাৎ সাহায্যকারী গোপালের চীৎকার কানে যায় তার —"বনমালীদা, সাবধান। তফজ্জল যাচ্ছে।" কথাটা কানে যেতেই চট্‌ ক'রে একবার দেখে নেয় বনমালী। বেশি দূরে নয় তফজ্জল। কয়েক হাত মাত্র সামনে রাস্তার ওপরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সে। মাথায় বিরাট ঝাঁকা বোঝাই মাটির কলসী-হাঁড়ি। তাড়াতাড়ি হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে বনমালী।

কিন্তু দুর্দৈব এমন যে যত চেষ্টা করে সরে যেতে ততই তফজ্জলমুখী হয় হ্যাণ্ডেলটা। এবং শেষ অবধি অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিয়ে ধাক্কা মারে যাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল তারই পশ্চাদ্দেশে।

ফলাফলের দিকে আর তাকায়নি তফজ্জল। মাথা থেকে ঝাঁকার বোঝা হাল্কা হ'তেই লাফিয়ে পড়েছিল বনমালীর ঘাড়ে। বনমালীও ছাড়েনি। বেধে গিয়েছিল গজকচ্ছপের লড়াই। রাস্তার একধারে সাইকেল আর একধারে ভাঙা হাঁড়িকলসীর রাশি, মাঝখানে যোযুদ্ধমান দুই অসুরাকৃতি মানুষ। হাট ভুলে ভিড় জমিয়েছে হাটুরে আর খদ্দেরের দল। যে যার পক্ষ বেছে নিয়ে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। এমন সময় বিরাট এক ইংরিজি আওয়াজে চমকে ওঠে জমায়েত জনতা। মুহূর্তে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় ভিড়ের একাংশ। উদ্দেশ্যটা, ইংরিজি বক্তা নিজেই দেখুন কি কাণ্ড হচ্ছে এই রাস্তার ওপরে। দেখেনও ভবদেব। পায়ের ঠেক্‌না দিয়ে সাইকেল দাঁড় করিয়ে তাকান দেহদুটির দিকে। তারপরই একঝাঁক ইংবিজি বুলি। এতক্ষণে বুঝি হুঁস হয় বনমালীদের। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়তে থাকে। মুখে দু'জনেরই অপরাধ স্বীকাবের চিহ্ন।

ইংরিজিতে উঠে দাঁড়াতেই আরম্ভ হয় বাংলার ধম্‌কানি। তারপরই পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা।

সেই পঞ্চায়েতে গিয়েই মহিমবাবু নিবিড় ক'রে পরিচয় পেলেন দুইটি গ্রাম্য চরিত্রের। বনমালী আর তফজ্জল। বাদী আর প্রতিবাদী। দু'জনেই স্বীকার করে বসল তাদের অপরাধ। বনমালীর নেমে পড়া উচিত ছিল সাইকেল থেকে আর তফজ্জলের সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মুস্কিলেই পড়ে যান মহিমবাবু। দু'জনেই অপরাধ স্বীকার করে বসলে ক্ষতিপূরণ করবে কে? বনমালীর বক্তব্য হচ্ছে দোষ যখন তার তখন খেসারৎ তাকেই দিতে হবে। কিন্তু বেঁকে বসেছে তফজ্জল। ধাক্কা দেওয়াটা যখন

বনমালীর ইচ্ছাকৃত নয় তখন বনমালীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা নেবে কেন সে? কথা শুনে রাগ ধরে যায় মহিমবাবুর। ইচ্ছে করেই সহজ মামলাকে পেঁচিয়ে দিচ্ছে ওরা। আর সুযোগ বুঝে মার্তণ্ডদেব এসে উপস্থিত হয়েছে মাথার ওপরে।

বাসুদেব চৌধুরীও পঞ্চায়েতের একজন। এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলেন মহিমবাবুর পাশে। এবারে একটু ধমকের সুরেই জিজ্ঞাসা করেন, "তাহলে মামলা তোমাদের নেই বলতে চাইছ?"

"আছে হুজুর।" তাড়াতাড়ি বলে ওঠে তফজ্জল।

"তাহলে আমার কথা হচ্ছে দোষ যখন দু'জনেই স্বীকার করছ তখন অর্দ্ধেক ক্ষতিপূরণ করবে বনমালী। দাম ছিল কত?"

"জী পাঁচ টাকা এগার আনা।"

"বনমালী, ওকে দু'টাকা সাড়ে তের আনা দিয়ে দিবি," বলেই মহিমবাবুর দিকে তাকান বাসুদেব চৌধুরী, "চলুন, উঠি সার। আপনার বেলাও হ'ল অনেক।"

মহিমবাবুর মাথায় তখনও ঘুরপাক খাচ্ছে এই অদ্ভুত মামলা। ঠিক বুঝতে পারছেন না, এরা এ ধরণের উল্টোপাল্টা কথা বলল কেন? পাশে চলতে চলতে বুঝিয়ে দেন বাসুদেব চৌধুরী, "আসলে দু'জনেরই মনে ইংরিজি বকুনি শোনবার ভয়।"

স্থান কাল ভুলে হো হো ক'রে হেসে ওঠেন মহিমবাবু।

দিবরাজপুর, খালিশপুর, আর কাঞ্চনপুর এই তিন গ্রামের সালিশি সভার মধ্যমণি তিনি; ফলে ছুটির দিন হলেই ছুটতে হয় তাঁকে পঞ্চায়েতের ডাকে। ভাল লাগে না, কিন্তু উপায়ও নেই। তেমনিই একদিন সালিশি থেকে ফিরেছেন অনেক বেলায়। স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করছেন। যদিও ভালভাবেই জানেন তিনি, বিশ্রামের 'ব'ও হবে না এখন। খোকনকে নিয়ে বসতে হবে। অঙ্কের মারামারি। দুই দুগুণো

যদিবা কোনরকমে চার হয়, ছুটো আম আর ছুটো আমে কিছুতেই চারটে আম হয় না। একটা আম বেড়ে যায়। কি ক'রে যে ঐ বৰ্দ্ধিত সংখ্যাটিকে কমাবেন তা আর ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারেন না মহিমবাবু। ফলে লেখাপড়ার নামে যে ধ্বস্তাধ্বস্তির সৃষ্টি হয় তা অবাঞ্ছনীয় বুঝতে পরেও মানসিক অস্থিরতাকে চেপে রাখতে পারেন না তিনি। বলেছেনও সে কথা কতবার লক্ষ্মীদেবীকে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তুপুরের বিস্তির আসর তিনি কিছুতেই ভাঙতে রাজী নন। অগত্যা অপ্রিয় কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধেই বয়ে নিয়ে চলতে হয় তাঁকে। বিশ্রামের নামে সেই আসন্ন সংগ্রামের জন্যে মনে মনে প্রস্তুত ক'রে নিচ্ছিলেন নিজেকে, এমন সময় বাইরে কার গলা শোনা যায়—"বাবা—"

ডাক শুনে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে যান মহিমবাবু। আবার কে ডাকে এই অসময়ে! এখানকার মানুষের আর সবই একরকম ভাল, কিন্তু সময়জ্ঞানের অভাবটাই বড় পীড়াদায়ক। তবুও একজন মানুষ যখন এসেছে বাড়ি বয়ে তখন দেখা না করাটা অভদ্রতা। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান তিনি। লম্বা একহারা চেহারার একটি মানুষ। খালি গা, পরণে খাটো একটি ধুতি। ছেঁড়া গামছাখানি দিয়ে মুখ মুচছে। পিঠের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঘামের স্রোত। তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়ায় লোকটি।

"সেলাম বাবা।"

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ওপরে রাখা একটি কাঁঠাল তুলে নিয়ে রাখে বারন্দার ওপরে। এমন বৃহদাকৃতি কাঁঠাল আজ এই প্রথম দেখলেন মহিমবাবু। ঐটি দেখেই বুঝতে পারেন লোকটির গা বেয়ে গঙ্গাবতরণের কারণটি।

ভেটটি না হয় বোঝা গেল কিন্তু কেন এল তা এখনও অজানিত। নেহাৎ খাতির ক'রে এই জিনিসটি দিতে এসেছে তা বিশ্বাস করতে

প্রবৃত্তি হয় না। স্বার্থ-গন্ধময় মনে হওয়ায় অন্তরেও একটি বিরূপ ভাব।

"তাত' বুঝলাম। কিন্তু কেন এসেছ তা বললেনাত' ?"

প্রশ্নটি কানে যেতেই মুখখানি গম্ভীর হয়ে যায় লোকটির। কি এক অপ্রিয় বক্তব্য যেন শোনাতে এসেছে সে। বলতেও মন চায়না, না শুনিয়েও উপায় নেই। মাথাটা ঝুলে পড়ে বুকের কাছে। যেন গুঙরিয়ে ওঠে, "কিছু সাহায্যের জন্যি আইছিলাম বাবা।"

ঠিক এই কথাটিই আশা করছিলেন মহিমবাবু। অর্থপ্রাপ্তির স্বার্থ জড়িত না থাকলে এতদূর বয়ে আনবে কেন ঐ বিরাট পদার্থটি। এ যেন ঘুষ দিয়ে কাজ আদায়। একটু অসন্তুষ্ট স্বরেই বলেন, "কি আর এমন অর্থ সাহায্য করতে পারি বল ? তার চাইতে তোমার কাঁঠালের যা দাম হয়—"

"তোবা তোবা।" মহিমবাবুর কথার সম্পূর্ণটা শোনবার ধৈর্য থাকে না লোকটির। দু হাতের তেলোয় দু'কান ঢেকে বলে ওঠে, "উডা খাতি দিছি বাবা। বিক্রী করতি আসি নাই। আর টাকাডা সিকেডাও চাইনে। না খায়ে মরি গুষ্টিশুদ্ধ তাও ভাল তবু ভিক্ষে করিতে পারব না। সের'ম সাহায্য নিতি পারব না।" বলে থেমে যায় লোকটি। একটু পরে বিড়বিড় ক'রে বলে, "আমি বলতিছিলাম কি, এ্যামন একটা কোন কাজ যদি পাতাম যাতে দিন গেলি আনা চারছয় পয়সা হয়, থাইলেই আমার চলে যাতো।"

থামে লোকটি। বুঝতে পারেন মহিমবাবু কিছু একটা উত্তর চাইছে সে হুজুরের কাছ থেকে। কিন্তু উত্তর চাইলেই দেওয়া যায় না তা। তার চাইতে মানুষটিকে আরও বিশদভাবে বোঝবার চেষ্টা করেন তিনি। স্পর্শকাতর মনটিকে যখন বোঝা গিয়েছে তখন কথা চালিয়ে যেতেও বিশেষ কষ্ট হয় না। নাম তার মোয়াজ্জেম বিশ্বাস। দিবরাজপুরে বাড়ি। চাষ আবাদের জমি কিছুই নেই।

ঘরামির কাজ কি জনমজুরের কাজ যা পায় তাই করে। কিন্তু কিছুদিন থেকে সে কাজেও যেন আকাল ধরেছে।

"আমরা বুড়োমদ্দ, একটা দুটো দিন না খালি কিছু আসে যায় না। কিন্তক্ ঐ গ্যাদাদুটোর জন্যিই য্যাতো ভাবনা বাবা। প্যাটও মানে না, মনও বোঝে না।"

থেমে যায় মোয়াজ্জেম। রেশ থেকে যায় মহিমবাবুর মাথায়। এই অশিক্ষিত মানুষটাকে কি সাহায্য তিনি করতে পারেন? জমির সঙ্গে এক দলিল দস্তাবেজ ছাড়া আর কোন প্রকার সম্বন্ধই তো নেই তাঁর।

"কিন্তক্ বাবা, দামটা য্যান নগদ পাই। এইটুকুর জন্যিই আইছিলাম। আদাব বাবা।"

বক্তব্য শেষ করে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয় মোয়াজ্জেম।

"দাঁড়াও," একটা কাজের বুদ্ধি এসে গিয়েছে মহিমবাবুর মাথায়, "শোন, এই জায়গাটা, এখানটায় একটা বাগান কবব ভাবছি। বেশ ভাল করে ঘিবে বাগান করে দিতে পারবে?"

জায়গাটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সে। যেন দৃষ্টির মাধ্যমে বাগানের একটা ছক এঁকে নিচ্ছে সে জমিখণ্ডের ওপরে। তারপর বলে, "কাল বিয়েন বেলা থাইলে দাও নিয়ে আসি। বাঁশও লাগবি গুটা কয়েক।"

"যা লাগে কিনে এনো। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেও। একটু দাঁড়াও," বলে বাড়ির ভেতরে চলে যান মহিমবাবু। ফিরে আসেন একটু পরেই। অগ্রিম মজুরী হিসাবে একটা আধুলি দেন মোয়াজ্জেমের হাতে।

আধুলিটার দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। তারপরই তার অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসে কয়টি কথা—"আজ দুটো দিন পর বাঁড়ির লোক দু'মুঠো ভাতের মুখ দেখবি।" বলে একবার তাকায় মহিমবাবুর দিকে। অসীম কৃতজ্ঞতায়

ভরা সে দৃষ্টি। এক মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপরেই সে দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে হন্ হন্ করে চলতে থাকে দিবরাজপুরের দিকে।

আলাপের প্রথম সূত্রেই মোয়াজ্জেমের মানসিক আকৃতির একটা পরিচয় পেয়েছিলেন মহিমবাবু। তাও সে খুব স্পষ্ট নয়। ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করে অনেকেই। বহুদেশে ভিক্ষাবৃত্তি আইনতঃ অপরাধ। এদেশে সে আইন না থাকলেও অপরাধবোধ যদি কারও থাকে বা মনুষ্যত্বকে ততখানি অপমান যদি কেউ না করতে চায় তাতে বিশেষ আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বিশেষ আশ্চর্য হয়েছিলেন তার দু'দিন পরে। যেদিন খোকনের স্লেটে মোয়াজ্জেমের হাতের লেখা দেখেছিলেন তিনি। তাঁর ধারণায় অশিক্ষিত এই লোকটির হাতের লেখা যে এমন ছবির মত হ'তে পারে এটা বিশ্বাস করতেও বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল তাঁর।

স্লেট নিয়ে খেলতে খেলতে কখন বাইরে এসেছে খোকন আর মোয়াজ্জেম তাকে হাতের লেখা দিয়ে বসিয়ে রেখেছে বারান্দায়। মহিমবাবু বাইরে এসে দেখেন খোকন একমনে হাতের লেখা লিখে চলেছে। একটু অবাকই হ'য়ে যান তিনি। পুত্রের এমন মনোযোগী রূপ বড় একটা দেখা যায় না। স্লেটখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখেন। এমন সুন্দর হাতের লেখা এ বাড়িতে কারও নেই। তবে এ লেখা কার? এদিকে দেরি সয় না খোকনের। হাত বাড়িয়ে বলে, "দাও না। হাতের লেখা না হ'লে মোজ্জেম দাদা হাটে বেড়াতে নিয়ে যাবে না।"

"এ হাতের লেখা কে দিল?"

"মোজ্জেম দাদা।"

পুত্রের উত্তর তাঁকে অবাক ক'রে দিলেও তার ভেতরে পেয়েছিলেন তিনি খুঁজে ফেরা পথের নিশানা। মনে হয়েছিল তাঁর, এই মানুষটার জন্যে যা'হক একটা ব্যবস্থা করতে বোধ হয় পারবেন তিনি।

কাজ হ'য়ে গেল মোয়াজ্জেমের। দা কুড়ুল ছেড়ে প্রৌঢ়ত্বের মাঝখানে এসে কলম নিয়ে বসল সে এজলাসের বাইরে গাছতলাতে একখণ্ড চট বিছিয়ে। সম্বল একটি কলম, এক দোয়াত কালি আর একখণ্ড চোষ-কাগজ। আর সব চাইতে বড় সম্বল যা তার, তা ঐ এজলাসেব ভেতরে বসে।

কাটাকুটি চলবে না দলিলে। কিন্তু কাটাছেঁড়া অক্ষরহীন দলিল খুব কমই আসে রেজিষ্ট্রী হ'তে। মা সরস্বতীর এজলাসে ঠাঁই না পেয়েই এই এজলাসের বাইরে মাদুর পেতে বসেছে মহুরীরা। বাঁধা গৎ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে যাদের কলম আর দখলে থাকে না। ফলে দলিলের নীচে লিখে দিতে হয় 'কৈফিয়ৎ'। ঐ কাটাকুটির সংশোধন-লিপি। সেই কাজেরই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন মহিমবাবু মোয়াজ্জেমকে। একখানা দলিল বাড়িতে এনে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে লিখতে হয় এই কৈফিয়ৎ। আর সেই কৈফিয়তের মজুরীও বেঁধে দিয়েছেন সেই সঙ্গে। চার আনা।

তবুও মুস্কিল। মাঝে মাঝেই হাকিমেব হুকুমে হুজুরে হাজির হ'তে হয় তাকে।

"ও মোয়াজ্জেম, তোমাব কৈফিয়তেব মধ্যেও যে আবার ভুল দেখা যাচ্ছে। .

অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে সে। সে জানে বিদ্যে তার প্রথম ভাগেই শেষ। দ্বিতীয় ভাগের শব্দেব শিলা সামনে পড়লেই হোঁচট খায়। দু'হাত পেতে দলিলখানা ফেবৎ নিয়ে আসতে হয় আবার। লিখতে হয় কৈফিয়তেব কৈফিযত।

তাহলেও খুশি সে। দিনে দুটি কৈফিয়ত লিখতে পেলেই চলে যায় তার। বেশির কথা ভাবতে সে ভয় পায়। অন্তরের পুঁজির অংশ খরচ করে অর্থের পুঁজি বাড়াতে সে রাজী নয়।' রাজী নয় সে সুশুক্তির মত আপন রসের প্রলেপ লাগিয়ে এক বাহ্যিক মুক্তা সৃষ্টি করবার জন্যে কাতরে কাতরে মরতে।

তবুও প্রশ্ন ওঠে। অনিবার্যভাবেই। সংসারী মানুষ মোয়াজ্জেম। দু'ছেলে আর এক মেয়ের বাপ। বড়ছেলে মহীউদ্দীনের শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিল সে অনেক কষ্টে। কোর্টচাঁদপুরে এক আত্মীয় বাড়িতে থেকে এই বৎসরই প্রবেশিকা পাশ ক'রে কলকাতায় গিয়েছে একটা কাজের চেষ্টায়। কাজ পায়নি এখনও। তাহ'লেও তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত মোয়াজ্জেম। প্রশ্ন উঠেছে ছোট ছেলে ইমামুদ্দীনকে নিয়ে। মকতবের পড়া শেষ হয়েছে তার। ছাত্র ভাল তাই মাইনে টানবার কষ্টটিও পেতে হয়নি মোয়াজ্জেমকে। এখন আরও এগুতে চায় ইমাম। কিন্তু তার ব্যবস্থা হবে কোথা থেকে? কোর্টচাঁদপুরের আত্মীয়কে আর কত চাপ দেওয়া যায়?

যেখানে একবার আশ্রয় মেলে, কোনও সমস্যার সম্মুখীন হ'লে সেইখানেই ছুটে যাওয়া জীবমাত্রেরই স্বভাব। মোয়াজ্জেমও ছুটে যায় মহিমবাবুর কাছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও নিরুপায় এখানে তিনি। আর্থিক সাহায্য করা চলবে না। নেবেনা সে। অথচ এই বিদেশে জানাশোনার সংখ্যা তাঁর এতই সীমাবদ্ধ যে অন্য কোন উপায় করবারও রাস্তা নেই। পুত্রের শিক্ষার জন্যে ব্যাকুল পিতার অন্তরের জ্বালা আপন অন্তরেও অনুভব করেন তিনি। কিন্তু দিতে পারেন না কোন সংযুক্তিই। রিক্ত হস্তেই ফিরে যেতে হয় মোয়াজ্জেমকে সেদিন।

মোয়াজ্জেম ফিরে গেলেও চিন্তার বোঝাটা নামেনি মহিমবাবুর মাথা থেকে। সুযোগ সন্ধানে ছিলেন তিনি, কিভাবে ইমামের হাই-স্কুলে পড়বার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যায়। সেই সময়েই একটি ঘটনা তাঁকে অনেকখানি সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে।

নিতাই পাল এসেছিল একখানি দলিল রেজিষ্ট্রী করাতে। বন্ধক রাখা ভদ্রাসনটুকু ফিরিয়ে নেবার অনেক চেষ্টাই ক'রেছিল সে। পারেনি। শুধু তাই নয়, ধারের সুদের পাকে পাকে

জড়িয়ে দম আটকে আসবার উপক্রম হ'য়েছিল তার। তাই অপারক সে এসেছিল বাড়িটা কুশীদজীবি নীলমণির নামে রেজিষ্ট্রী করে দিতে। প্রথমেই মুড়োমেরে রেখেছিল নীলমণি—দেখ বাপু, সুদত' একপয়সাও ঠেকালে না, পরে যে রেজিষ্টিরি করবার খরচাডা চাবা, তা কিন্তু হচ্ছে না। ওটাই আমার সুদ।

অনেক কষ্টে ষ্ট্যাম্পের টাকাটা জোগাড় করেছিল সে। মুহুরীও দলিল লিখে দিয়েছিল ধারেই। কিন্তু ভুল সংশোধনের কৈফিয়ৎ লেখবার পর মোয়াজ্জেম ছাড়েনি তাকে। কাঁধের গামছা চেপে ধরেছিল তার,—"পয়সা চার আনা সাফ জায়গায় বাখে তবে ওঠ।"

দুঃখে অপমানে চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল নিতাইএর। হাত-জোড় ক'রে বলেছিল, "মিঞা ভাই, পয়সা আমি কারও মাবব না। আর কি জন্যিই বা মারব? কিডা আছে আমাব বল? শুধু দুটো চারটে দিন সোময় দ্যাও।"

"থও কর তুমার সোময়। তুমাদেব দেখতি গেল আমাব চলে না," বলেই চীৎকার করে উঠেছিল মোয়াজ্জেম, "আমাব ইমামের যে ইদিক লিখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, সিটা দ্যাখে কেউ?"

চমকে উঠেছিল আর আর মহুরীরা সেই চীৎকার শুনে। উঠেও এসেছিল দু'একজন ঘটনাটা জানতে। তাদেরই একজন নিজে জামিনদার হ'য়ে ছাড়িয়ে দেয় নিতাইকে।

অবিশ্বাস্য এই সংবাদের আঘাতে মোচড় খেয়ে গিয়েছিল অন্তরের গভীরে বাঁধা শ্রদ্ধার তন্ত্রীগুলি। চলতে ফিরতে ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে বেসুরো এক আর্ত্তনাদে। বিরাট এক আশ্বাসের পিছনে যে এতখানি হতাশা লুকিয়ে থাকতে পারে, ভাবতেও পারেননি তিনি। মানুষ খোঁজা মন, বহু তরঙ্গের আঘাত বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে মানব সাগরের কূলে কূলে। দেখা যখন মিলল, ভরে উঠল

বুকখানা। হারিয়ে যায়নি তাহ'লে এখনও। ওপারের প্রথম মহাযুদ্ধের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হ'য়ে যায়নি এপারের হৃদয়গুলির। কিন্তু তাই যখন প্রমাণিত হ'ল যে তিনি সোনা ভেবেছিলেন নিছক গিল্টীকে, তখন সে খেদ বহন করাও কষ্টকর হ'য়ে উঠল তাঁর পক্ষে।

এর পূর্বে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে খোকনকে সঙ্গে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুতেন। এবারে তাও গেল বন্ধ হ'য়ে। সময় কাটে বাগান নিয়ে। মানুষের সঙ্গে মিশবার প্রবৃত্তিটাই যেন গিয়েছে হারিয়ে। তার চাইতে অনেক বেশি বিশ্বাস করা যায় এই চারাগুলিকে। উপযুক্ত জমি আর পরিচর্য্যা পেলে এরা পুষ্পবতী হয়ই।

নিজে মালি। খোকন সহকারী। ফুট ফরমাস খাটে আর জিজ্ঞাসা করে তার শিশু-সুলভ মনের প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসাই। শিশু-মন স্থীরতাহীন। সরে বেড়ায় এখান থেকে ওখানে, খেয়ালী বাতাসের মত। কখন দাঁড়িয়ে শোনে বাবার উত্তর, কখনও না সরে যায় দূরে। সেদিকে খেয়াল নেই মহিমবাবুর। ভবিষ্যত পুষ্পের জন্মদাত্রীর পরিচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপগুণের বিশদ বর্ণনা দিয়ে চলেন তিনি আপন অঙ্গজকে। এমন সময় মূর্ত্তিমান ঝড়ের মত এসে উপস্থিত হয় মোয়াজ্জেম, "বাবা—"

তির্যকদৃষ্টিতে তার দিকে একটিবার তাকিয়েই প্রাণহীন গলায় জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু, "কি চাই?"

স্বরটা বিশেষ খেয়ালই করেনি মোয়াজ্জেম। শুনেছে শুধু প্রশ্নটা। তারই উত্তর দিয়ে যেতে থাকে সে হড়বড় ক'রে।

"আজ গো-হাটা ছিলত' বাবা, তা ইজলাসের কাম শেষ হতিই সুজা চলে গেলাম ওখেনে। দাদাভাইএর জন্যি একটা গাইএর খোঁজ করতিছিলাম। তা একখান্ গাই যা দ্যাখলাম বাবা—"

"কে বলেছিল তোমাকে গরুর খোঁজ করতে?"

আবেগের মুখে গম্ভীর গলার কঠিন প্রশ্নে থতমত খেয়ে যায়

মোয়াজ্জেম। উত্তর আসছে না তার। উৎস-মুখে চাপা পড়েছে অভিমানের শিলা। কোন রকমে কয়টি শব্দ বের ক'রতে চেষ্টা করে সে সেই চাপের পাশ দিয়ে—"কেউ না বাবা, আমি আপনা থিকেই—" কথা সরে না আর। ধীরে ধীরে সরে যায় সে। বাগানের বাইরে এসেও নুয়ে পড়া মাথাটা সোজা হয়না তার। পরম নির্ভয়ের স্থান থেকেই অতর্কিতে এসেছে এক চরম আঘাত। মহিমবাবুও একবার মুখ ফিরিয়ে দেখেন না, তাঁর ছোট্ট একটি প্রশ্ন কতখানি আঘাত করেছে অপর একটি স্বার্থ-গন্ধহীন মনে।

এবপর কিছুদিন আর তার কোন খোঁজই রাখেননি মহিমবাবু। খেয়াল ক'রে দেখতেও ভুলে গিয়েছিলেন তার লেখা কৈফিয়ৎ বুকে নিয়ে কোন দলিল হাজির হয়েছে কিনা। খেয়াল করিয়ে দিলেন ভবদেব চৌধুরী। সাইকেল নিয়ে গিয়েছিলেন দিবরাজপুর পেরিয়ে আরও কিছুটা দূরে। বিঘে কুড়ি নাবি জমি আছে সেখানে তাঁর। আউস হয় না, হয় আমন। কাটবার সময় হ'য়ে এল। গিয়েছিলেন তারই ব্যবস্থায়। কিন্তু চাষীরা কেউই হাজির হয়নি। বোধহয় পঙ্গপাল হ'য়ে গিয়ে পড়েছে অন্য কোনও ক্ষেতে। জনমনুষ্যহীন ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনেই কিছুটা ইংরিজি বকুনি ঢেলে ফিরছিলেন কাঞ্চনপুর। এমন সময়, খালিশপুরের মাথায় এসে দেখা মহিমবাবুর সঙ্গে। প্রাতভ্র্মণে বেরিয়েছিলেন তিনি। নামতে হ'ল সাইকেল থেকে।

"নমস্কার সার. কেমন আছেন?"

"ভালই। এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

"জমিজমা কিছু আছে ওদিকে। আমনটা কাটাতে হবে।"

কথা বলতে বলতে দু'জনে ফিরতে থাকেন। মহিমবাবুর বাড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে যান ভবদেব।

"কি হ'ল? দাঁড়িয়ে গেলেন যে?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

প্রশ্নটা বুঝি কানেই যায়নি ভবদেবের। কানেত' যায় না, যায় মনে। সদর দরজা ঐ কান। তাই মনের দরজায় খিল পড়লে প্রবেশ পথও অবান্তর। বাগান নয়, বাগানের বেড়াটা দেখছিলেন ভবদেব। মনটা আটকে গিয়েছিল সেখানেই। এ ধরণের নক্সা-কাটা বুনুনি, যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে তাঁর। আরও কাছে গিয়ে ভাল ক'রে দেখতে থাকেন। বর্তমানের সঙ্গে কোন এক অতীতকে মেলাবার চেষ্টা। হঠাৎ মহিমবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়ান ভবদেব. "মনে পড়েছে! বড় কর্তার মেয়ের বিয়ের সময় বাইরে একটা গেট তৈরী ক'রে দিয়েছিল। এমনি নক্সাকাটা। মোয়াজ্জেম তৈরী করেছে না?"

"হ্যাঁ।"

"ভালকথা," বলেই যেন সক্ষণে ফিরে আসেন ভবদেব, "বড় জব্বর কথা মনে পড়ে গেল। চলুন, চলুন, ঘরে চলুন।"

তাড়াতাড়ি ক'রে সাইকেলটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রাখতে রাখতে একবার শুধু "বাঃ, সুন্দর বাগান তৈরী ক'রেছেন" বলেই আবার ফিরে যান পূর্বপ্রসঙ্গে, "বুড়োমদ্দর সে এক কীর্তি। চলনত' ঘরে, বলছি সব। আপনার কাছে নিতাই পাল এসেছিল না একটা দলিল রেজিস্ট্রী করাতে? সেই ঘটনা। চলুন চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে কি বলা যায় সব কথা?" তাঁর 'চলুন চলুন' শুনে এগুতে যান মহিমবাবু কিন্তু কথায় মশগুল ভবদেব ততক্ষণে ভুলে গিয়েছেন সে কথা।

"আমি কি অত সব জানি? বাড়ি ফিরছিলাম নিতাইএর বাড়ির পাশ দিয়ে। তা প্রায় দশবার দিন আগের কথা। রাত তখন—ঘড়ি দেখিনি। যাক্ যে যাক্, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। কান্না শোনা যায় কার? নিতাইএর বৌটাত' আগেই গিয়েছে। ছেলেপুলেও নেই ওর। একি তাহ'লে বৌএর শোকে স্বামীর কান্না! ফিরতে হ'ল। আস্তে আস্তে গিয়ে ঠেলে উঠলাম ওর বারান্দায়।

জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি—ওরে বাবা এযে রাম-রহিমের কারবার! আমাদের নিতাই আর আপনার মোয়াজ্জেম গলা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না!" বলতে বলতে আবার ঘরে যাওয়ার ঢেক ওঠে ভবদেবের, "ওকি মশাই, ঘরে যাবেন, না ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখবেন ভদ্দরলোকের ছেলেকে?" যেমন বলা তেমনি ভুলে যাওয়া, "আমি ভাবচি, নিতাই না হয় কাঁদতে পারে। বৌ গেল, বাড়ি গেল, কাদবার কারণ আছে। কিন্তু মোয়াজ্জেম কাঁদে কেন? ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শুধুইত' আর কাঁদবে না, মুখে বলবে কিছু নিশ্চয়ই।"

"বলল?" আগ্রহের চাপে ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যেতে চায় মহিমবাবুর।

"বলবে না! না বললে আমি শুনব কোত্থেকে? বলে, মাথার ঠিক ছিল না নিতাই ভাই। ইমামটার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, সেই চিন্তাই করতিছিলাম আর সেইমুখেই আসে পড়লে তুমি। কেমন যেন হয়ে গেলাম। চার আনা পয়সা কিছু না নিতাই ভাই, লাখ টাকাও না। আমি যে আজ তোমার কাছ থিকে দূরে সরে গেলাম—" হঠাৎ নিচু হ'য়ে সাইকেলের পেডালে কি একটা দেখতে থাকেন ভবদেব। বোঝেন মহিমবাবু। সময় দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, কখন মাথা তুলবেন ভবদেব আর শেষ করবেন তাঁর কথার শেষাংশ। শুধু জানতে দেন না আপন অন্তরের আক্ষেপকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভবদেব "চলি, অনেক বেলা হ'য়ে গেল" বলে ভুস্ ক'রে মাথা তুলেই উঠে পড়েছিলেন তাঁর সাইকেলে।

বাড়ির দোড়গোড়ায় এসেও বাড়িতে ঢোকা হয়নি তাঁর। ভবদেবের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই পা বাড়িয়েছিলেন দিবরাজপুর অভিমুখে। যাতায়াতে মাইল তিনেকের ধাক্কা। গিয়ে পৌঁছুলেন যখন ঘামে ভিজে উঠেছে জামা। বাড়িটার দরজার কাছে গিয়েই হাঁক দিয়ে ওঠেন—"মেয়াজ্জেম—"

ডাকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে যায় বাড়ির ভেতরে। চাপা গুঞ্জনধ্বনি তার মহিমবাবুর কানেও এসে পৌঁছয়। তারপরই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে মোয়াজ্জেম।

"তুমি কি রকম মানুষ বলত?" ধমক খেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। দোষারোপটা কিসের ঠিক হদিস্ ক'রে উঠতে পারছে না যেন।

"আমরা না হয় কেউ নই। কোন দরকারও নেই কিছু হওয়ার। কিন্তু ছেলেটা যে কেবলি মোজ্জেম দাদা মোজ্জেম দাদা ক'রে কাঁদছে—আর এখানকার ঐ গঙ্গার মরা পানি খেয়ে খেয়ে—ওকে কি দুধ বলে? হুঁ, মানুষ যে এমন হয়—" কথাটা অসমাপ্তই থেকে যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাটতে থাকেন মহিমবাবু।

আর তার এক সপ্তাহের ভেতরেই মোয়াজ্জেমের দাদাভাইএর জন্যে এসে যায় দুটি গাই। একটি বাছুরশুদ্ধ আর একটি গাভীন্। তাদের পরিচর্য্যার ভার মোয়াজ্জেমের নিজের ওপরে।

এর কিছুদিন পরেই কাঞ্চনপুরে স্কুল করলেন চৌধুরীরা। ইমামুদ্দীন সেই স্কুলের প্রথম অবৈতনিক ছাত্র। ব্যবস্থাটা করেন মহিমবাবু। খোকনও ভর্ত্তি হয়। ইমামের হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে সে তার বিদ্যালয়ের দিকে। সুখে একটা পরম নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলেন মহিমবাবু।

তারপর একে একে অনেকগুলি দিনই কেটে যায়। নির্ঝঞ্ঝাট দিনগুলি রেখে যায় না কোনও ইতিহাসের ছাপ। না রাখুক, শান্ত সুন্দর দিনগুলিও কিছু কম কাম্য নয় তাঁর কাছে। জীবনটাইত' ঝামেলার আগাছায় বোঝাই, তারই ভেতরে যদি পাওয়া যায় বেতস ঝোপের নিচেকার সামান্য পরিচ্ছন্নতা, ক্ষতি কি? মনের একতারাটায় বাজে টুং টুং ক'রে এক শান্তির সুর। এজলাসের ভেতরে কাজ করে চলেন মহিমবাবু, বাইরের গাছতলায় মোয়াজ্জেম।

দেখতে দেখতে কেটে যায় প্রায় দুটি বৎসর। ব্যস্ত হয়ে পড়েন মহিমবাবু। গতসনের রেজিস্ট্রীগুলি সদর অফিসে পাঠাতে হবে। এমন সময় তালাসী 'ফি' জমা পড়ল। একখানি দলিলের নকল দেখে যাবে মুকসুদ মিঞা। 'না' বলবার কিছু নেই। আইন আছে তালাসী 'ফি' জমা দিলে রেজিস্ট্রী বই দেখতে দিতে হবে।

লোকজনের ভিড় নেই রেজিস্ট্রী অফিসে। জমে যাওয়া কাজ তুলতে ব্যস্ত আলিসাহেব ও অন্যান্য কর্মচারীরা। মহিমবাবু গিয়ে বসেছেন খাস কামরায়। তাঁরও হাতে প্রচুর কাজ। ওধারে এজলাস ঘরের এককোণে বসে নাক দিয়ে একটু দিবাসুপ্তির আমেজ উপভোগ ক'রে নিচ্ছে পিয়ন গদাধর। অভ্যাসমত চোখ-দুটি খোলা। যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হাকিমের টেবিলের দিকে। শুধু তার নাকের শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে নিদ্রার গভীরতার মাপ।

'বস দিচ্ছি,' বলে আলমারীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় আলিসাহেব।

ঘরের এককধারে বেঞ্চির ওপরে গিয়ে বসে পড়ে মুকসুদ মিঞা। অভাবক্লিষ্ট চেহারা। কোন এককালে চশমা নিয়েছিল। তার নিকেলের ডাঁট একটি গোড়া থেকেই ভাঙা, অপরটির মাঝখান থেকে। একটুকরো কালো কার দিয়ে মাথা পেঁচিয়ে বেঁধে চশমাটিকে নাকের ওপরে ধরে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গায়ে একটি ডোরা কাটা ফতুয়া, পরনে মোটা খাটো একটি ধুতি। মুখ দেখলে মনে হয় অনুসন্ধান নয়, স্রেফ শ্রান্তি অপনোদনের জন্যেই সে এসে বসেছে এখানে।

রেজেষ্ট্রীখানা বের ক'রে দিয়ে নিজের কাজে গিয়ে বসে আলি-সাহেব। বইখানা খুলতেই মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মুকসুদ মিঞার। দৃষ্টি চলেনা ভাল। চশমা নেবার পর কতদিন কেটে গিয়েছে কে জানে। ইতিমধ্যে দৃষ্টিশক্তি আরও গিয়েছে কমে, কিন্তু পরকলার শক্তি হয়নি বাড়ান। এতসব করতে যে

শক্তির প্রয়োজন তারই একান্ত অভাব তার। ঝুঁকে পড়ে লেখার কিছুটা অংশ পড়ছে তারপর আবার পাতা উল্টে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় দলিলের খোঁজে। কত নম্বরের দলিল সেইটিই বোধ হয় জানা নেই তার।

বাইরে তখন মুহুরীরা মত্ত হয়ে পড়েছে গোঁসুলীতে। অফলা দিন রোজগারের কোনও আশা নেই দেখে ঘিরে ধরেছে মোযাজ্জেমকে। প্রশ্নের তাদের কোন মা বাপ নেই, তেমনি নেই বয়সের তারতম্য জ্ঞান। স্বভাব-গম্ভীর মোযাজ্জেম পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ওদের প্রশ্নবাণে। সহকর্মীরা বয়স মানে না, ধার ধারেনা গাম্ভীর্যের। তারা এক। মুখ না খুললেও বাধ্য হয়েই সহ্য করতে হয় ওদের ফষ্টি নষ্টি। একজন প্রশ্ন করে আর একজন মোযাজ্জেমের হয়েই উত্তর দেয়। একটা হাসির রোল ওঠে গাছতলার আসরে।

সেই হাসির রোলকে এক বিপরীত ধাক্কা দিয়ে চীৎকার ওঠে এজলাসের ভেতর। আলিসাহেবের কণ্ঠস্বর। ছুটে যায় সকলে এজলাস ঘরের ভেতরে। গদাধর তুলে ধরেছে মকসুদ মিঞার দু'হাত আর আলিসাহেব হাতি পাতি ক'রে খুঁজছে তার ফতুয়ার পকেটগুলি। এদিকে মহিমবাবুও এসে দাঁড়িয়েছেন আলিসাহেবের পাশে। ফতুয়ার পাশের দুটো পকেট খোঁজবার পর বুকপকেটে হাত দিতেই খস্ খস্ ক'রে ওঠে একটুকরো কাগজ। কাগজের নিচে ছোট্ট একটি ছুরি। কাগজের টুকরো আর ছুরিটা টেনে বের করে আলিসাহেব।

"ভলুমখানা কেটে কি করেছে, দেখুন সাব।"

"ভলুম কেটেছে?" যেন আকাশ থেকে পড়েন মহিমবাবু। বলেন, "দেখুন দিকি, কোন্ দলিলের নকল থেকে কেটেছে?"

রেজিষ্ট্রীখানা নিয়ে খুঁজতে থাকে আলিসাহেব। সেই সুযোগে আপন যোগ্যতার প্রমাণ দিতে থাকে গদাধর। বলে সব, শুধু

ঘুমের কথাটাকে একটু রদবদল ক'রে। আসল ঘটনা হচ্ছে হঠাৎ জেগে যেতেই নজরে পড়ে তার ছুরি দিয়ে রেজিষ্ট্রী বইএর পাতা কাটছে মিঞাসাহেব। সে তখন নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ায় আলি-সাহেবের পিছনে। তারপর তাকে আস্তে ধাক্কা দিয়ে ইসারায় দেখিয়ে দেয় কি কাণ্ড হচ্ছে রেজিষ্ট্রী বইএর ওপরে। দলিলের অংশটি কাটা হ'য়ে গিয়েছে ততক্ষণে। কর্তিত অংশটি তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলে উঠে দাঁড়ায় মিঞাসাহেব। একবার এজলাসের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে হয়—কিন্তু সে সুযোগ আর মেলেনা তার। চীৎকার ক'রে ছুটে এসে তাকে চেপে ধরে আলিসাহেব।

"কি হ'ল? পেলেন?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"দেখছি সার।"

আরও দ্রুত পাতা উল্টোতে থাকে আলিসাহেব। খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় এসে থেমে যায় হাত। গত বৎসরের শেষের দিকের একখানা দলিলের নকল। তার প্রথমাংশ অনেকখানি কেটে বের ক'রে নিয়েছে। অর্থাৎ দাতা, গ্রহীতা এবং সেই সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যেরও বিলোপ সাধন করা হয়েছে। দেখে-শুনে মাথায় আগুন জ্বলে যায় মহিমবাবুর। কিন্তু বিশেষ হৈ চৈ করা তাঁর স্বভাব নয়। ধীর গম্ভীর ভাবেই বলেন, "আলি সাহেব, থানায় একটা খবর দিতে হবে। আর গদাধর, ওর পাশে বসে থাক। বেরুতে দেবেনা এই ঘর থেকে।"

হুকুম জারি করেই চলে যান না তিনি। দাঁড়িয়ে থাকেন আলিসাহেবের রওনা দেওয়ার অপেক্ষায়। তালা খুলে বারান্দা থেকে সাইকেল নামিয়ে নিয়ে চড়ে বসে আলিসাহেব। মহিমবাবুও অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রেজিষ্ট্রীখানা আর কেটে নেওয়া অংশটুকু নিয়ে গিয়ে বসেন নিজের চেয়ারে। কাটা অংশটুকু ঠিক জায়গায় বসিয়ে পড়তে থাকেন দলিলটি। কিছুটা অংশ পড়তেই মনে পড়ে তাঁর—মথুরাপুরের প্রতুল সেন উত্তর চরের বনমালী দাসকে এই

১৫ বিঘে জমি দান করেছিল। দলিলের বক্তব্য আর মুকসুদের কাজ দেখে অবাক হয়ে যান মহিমবাবু। তাহ'লে কি বিশেষ কিছু আছে এর ভেতরে? কিন্তু কি আছে? প্রশ্নটা ঘুরে ফিরেই আঘাত করতে থাকে তাঁর মনের দরজায়। অথচ উত্তর পাওয়ার কোনও রাস্তাই নেই। এক ঐ বৃদ্ধ। সেও কি জানে এর ইতিবৃত্ত? হয়ত' অভাবের তাড়নায় এই দুষ্কর্মে রাজী হয়েছে। যাই হ'ক, এখন এই দুষ্কৃতকারীকে পুলিশের হাতে সঁপে দেওয়াই হচ্ছে তাঁর কাজ। তারপর মামলা উঠলে যে পথটুকু পাড়ি মেরে যেতে হবে তাঁকে তার কথা ভেবেই বিষাদ হয়ে ওঠে তাঁর অন্তর। তিক্তদৃষ্টিতে তাকান মুকসুদ মিঞার দিকে। মানুষের মুখোসের আড়ালে কত রকমের শয়তানই না মুখ লুকিয়ে থাকে। এমন সময় অস্ফুট একটি শব্দ ক'রে ওঠে মুকসুদ মিঞা—'আল্লারে!' শব্দটা মুখ থেকেই নয় শুধু, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই বেরিয়ে আসে বলে মনে হয়। অসহায়তার শেষ পর্যায়ে এসে সে যেন জানাচ্ছে তার আল্লাকে যে লড়াই করবার ক্ষমতা তার নিঃশেষে শেষ হ'য়ে গিয়েছে। হেরে গিয়েছে সে তার জীবন-দ্বন্দ্বে। তাই অসহায়ের শেষ সম্বল আল্লারই পায়ে তার সমস্ত প্রশ্ন সমর্পণ করে শান্তি পেতে চায় সে।

শব্দটি শুধু কানে নয়, মনে গিয়েও আঘাত করে মহিমবাবুর। স্থির দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকেন মুকসুদ মিঞার দিকে। দারিদ্র-ক্লিষ্ট চেহারার এই মানুষটিকে দেখে সহানুভূতিই জাগে তাঁর অন্তরে। চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধটির কাছে গিয়ে দাঁড়ান তিনি।

"ছিঃ, এমন কাজ কখনও করে?"

একটিবার মুখ তুলে হাকিমের দিকে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নেয় মুকসুদ মিঞা। কিসের এক নিরুদ্ধ আবেগে ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে তার। তারপরই স্থির হ'য়ে গিয়ে হঠাৎ টান হ'য়ে বসে লোকটি। কোথায় ছিটকে যায় তার অসহায় ভাব। উৎকর্ণ

সে জ্বল জ্বল করা দুটি চোখ মেলে তাকায় এজলাস ঘরের দরজার দিকে। তার সে ভাব লক্ষ্য ক'রে দরজার দিকে তাকাতেই কানে আসে তাঁর, কে যেন 'হুজুর, হুজুর' বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। স্বরটা ক্রমেই কাছে আসতে থাকে। একটু পরেই ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে একটি লোক—

"হুজুর, অলিসাহেবের মাথা ফাটাইছে।"

আর কোন কথা বলবার সুযোগই পায়না লোকটি। তার পূর্বেই চীৎকার ক'রে ওঠে মুকসুদ মিঞা, "না, না—" তারপরই দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে, "আল্লা আর পারিনে আল্লা।"

এক টুকরো কালো মেঘ, চোখে তার ঝড়ের সঙ্কেত। মুকসুদের ছোট্ট ঘটনার পিছনে বিরাট এক ষড়যন্ত্রের আভাষ। চিন্তিত হ'য়ে ওঠেন মহিমবাবু। মানুষটাকে ছেড়ে দেওয়াও যায়না, আবার কাউকে যে থানায় পাঠাবেন সে উপায়ও নেই। কে যাবে পাঁচ ছ'মাইল পথে হেঁটে থানায় খবর দিতে? তারও যদি মাথা ফাটে? ভেবে পান না, কি ভাবে সম্পন্ন করবেন তাঁর আশু কর্তব্য কয়টি। আলিসাহেবেরও একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। এমন সময় মনে পড়ে ভবদেবের কথা। হ্যাঁ, এই মানুষটি হয়ত' কোনও একটা উপায় ক'রে দিতে পারেন। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে মোয়াজ্জেমকে ডাক্ দেন তিনি।

একটু দূরে গাছ তলাতে বসে ছিল মোয়াজ্জেম। দু'হাঁটুর ভেতরে মুখখানি গোঁজা। দেখলে মনে হয়, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েছে সে। মহিমবাবুর ডাক কানে যেতেই চম্‌কে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে আসতে থাকে। তার এগিয়ে আসা দেখে মনে হয় কেউ যেন ঠেলে আনছে তাকে।

কাছে এসে দাঁড়াতেই বলে ওঠেন মহিমবাবু, "একবার ভবদেব বাবুকে খবর দেবে?"

হুকুম শুনে হুজুরের মুখের দিকে একবার তাকায় মোয়াজ্জেম।

তারপরই মুখ নামিয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, "মিঞাক্ ছাড়ে দেওয়া যায় না বাবা ?"

প্রশ্নটি অন্য কারও মুখ থেকে প্রকাশ পেলে হয়ত' বিশেষ আশ্চর্য হ'তেন না মহিমবাবু। কিন্তু তাঁর মনে ওর আসন পৃথক। অতি সাবধানী মানুষ। আপন অধিকারের সীমানা অতিক্রম ক'রে অপরের গণ্ডীর ভিতরে ভুলেও পা বাড়ায় না সে। তবুও তার এই আপন আইন থেকে বিচ্যুতি ঔৎসুক্য জাগায় মহিমবাবুর মনে। হয়ত' বিশেষ কিছু আছে এই ক্ষুদ্র ঘটনার পিছনে, এই ভেবেই বলেন তিনি, "আজ রাত্রে একবার দেখা করবে আমার সঙ্গে ?"

ঠিক এই রকম একটা হুকুম যে আসবে বোধহয় ভেবেই রেখেছিল সে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আজ না বাবা, কাল বিয়েন বেলাতো যাবোই গাই দু'তি. তখোন কথা হবিনি। আজ যাই দেখি, ছোট কত্তাক্ ডাকে দি'গে যাই।"

আর দাঁড়ায় না মোয়াজ্জেম। দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তার নির্দ্দিষ্ট গাছের নিচে তুলে নেয় চট, দোয়াত কলম, আর চোষ-কাগজ। তারপর সেগুলি নিয়ে এসে এজলাস ঘরের এক-কোণে রেখে আবার হাটতে থাকে পিছন ফিরে। লক্ষ্য এবারে কাঞ্চনপুর।

থানায় চালান হ'য়ে গিয়েছে মুকুন্দ মিঞা। ভবদেব এসেই সব ব্যবস্থা করেন। নিজের কাঁধে তুলে নেন মহিমবাবুর সমস্ত দায়ীত্ব। কাজের ভেতর দিয়েই মনের ভাবের প্রকাশ। তাঁর কাজের কঠোরতাই প্রকাশ করে দেয় যে এ ধরণের জঘন্য কাজের প্রশ্রয়দাতা তিনি নন। লোক পাঠিয়ে দারোগাবাবুকে ডেকে আনান, রেজিষ্ট্রী অফিসের সামনে একজন রাত্রের পুলিশ প্রহরীরও ব্যবস্থা করেন। তারপর নিজের সাইকেলে চাপতে চাপতে বলেন, "পরে আসব একদিন, তখন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।"

সহজ সরল কাজ ভবদেবের। বোঝা যায়। বোঝা যায়নি মোয়াজ্জেমকে। একটা কিসের ইঙ্গিত ছিল তার কথায়। কি সে কথা? কি ইতিহাস লুকিয়ে আছে মুকসুদের কাজের অন্তরালে? চিন্তার উত্তাপে চোখের ঘুম গিয়েছে ছিটকে। প্রায় সমস্তটা রাত ধরে এপাশ ওপাশ করবার পর ভোরের অন্ধকার সবে তার আবেশ নিয়ে এসেছে তাঁর দু'চোখের পাতায়, এমন সময় সদর দরজার কড়া নড়ে উঠতেই ছিটকে যায় সে আমেজ। ডানা ঝটপটিয়ে ওঠে ঝিমধরা কৌতূহলটা। গোয়াল ঘরে গরু দুটোও বুঝি বুঝতে পারে তাদের সেবকের আগমন। ডাকতে থাকে তারা। পরম নিশ্চিন্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েই চমকে ওঠেন মহিমবাবু। মোয়াজ্জেম নয়, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ওয়ালেং হোসেন অর্থাৎ বড় মিঞা।

"এট্টা কথা ছিল হুজুর।"

"কথাটা দিনের বেলা হ'লে চলত না?" লোকটির এই অসময়ের উপদ্রবে মেজাজ তাঁর রুক্ষ।

"দিনের বেলা হলি কি আর রাত্তিরে আসি?" অমায়িক হাসি লোকটির মুখে, "এট্টু বাইরে আসতি হবি হুজুর।"

বাইরে যেতে বল্লেই আর যেতে পারেন না তিনি। যা পারতেন পরশুকাল অবধি, আজ তা আর সম্ভব নয়। প্রচুর বিশ্বাস করতেন তিনি এখানকার মানুষকে। সে বিশ্বাসের ভিতে পড়েছে কঠিন আঘাত। তার ওপরে আলিসাহেবের মাথায় লাঠির আঘাত প্রমাণ করে দিয়েছে যে এর পিছনে বিশেষ শক্তিমান কেউ আছে, যে পিছপা নয় যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। অতএব সাবধান হওয়াই সমীচীন।

"বাইরে যাওয়ার দরকার কি?" মহিমবাবু অভ্যর্থনা জানান তাঁর অতিথিকে, "আসুন না, ঘরে এসে বসুন। এ ঘরে এখন আসবে না কেউ।"

অগত্যা ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ায় বড়মিঞা। মেদবহুল

চেহারা। শ্মশ্রু গুম্ফারণ্যে আবৃতপ্রায় মুখাবয়ব। আর্থিক সম্পদের গাম্ভীর্য শুধু তার মুখে নয়, সমস্ত দেহে।

"বসুন," বলে মহিমবাবু এসে বসেন একটি চেয়ারে।

অগত্যা বড়মিঞাকেও বসতে হয়। তারপর অপেক্ষার পালা। নিঃশব্দে কেটে যেতে থাকে সময়। অন্তরে অস্থিরতা মহিমবাবুর—কতক্ষণে কথা শেষ ক'রে বিদায় নেবে বড়মিঞা আর ফিরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেবেন তিনি বিছানায়। বড়মিঞার হিসাব-রত মন। হিসাব ক'রে চলেছে এই হাকিমটির মানসিক শক্তির। জীবনের তিনটি বৎসর যে এখানে কাটালেন এই হাকিম সাহেব তার ভেতরে এমন কোনও কাজ করেছেন কিনা যাতে তাঁর মনের তিলমাত্র দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

মুহূর্তে মুহূর্তে এগিয়ে যায় সময়। আসন্ন প্রভাতকে সাদর আহ্বান জানাতে ব্যস্ত বিহঙ্গকুল। একটু নড়েচড়ে বসে মহিমবাবুই ভাঙ্গেন প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরের সেই নিস্তব্ধতা।

"কি বলবেন বলছিলেন?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে টান হ'য়ে বসে বড়মিঞা। বলে, "আমি বলতিছিলাম কি হুজুর, মানুষেক্ মারা খুব সহজ, বাঁচানডাই কষ্ট। না হুজুর?"

"তাত' বটেই।"

ঠিক ধরা যাচ্ছেনা এখনও কি কথা পাড়তে এসেছে বড়মিঞা এই রাতের অন্ধকারে।

"তাই বলতিছিলাম, আপনে ইচ্ছে কবলি একডা সোমসারের সবগুলোন্ জান্ নিতিও পাবেন আবার দিতিও পাবেন।"

"এটা কি একটা কথা হ'ল বড়মিঞা?" একটুখানি কাষ্ঠ-হাসি হাসেন মহিমবাবু, "জান নেওয়া দেওয়ার আমি কি মালিক?"

"না, তা না।" বড়মিঞার মুখে গাম্ভীর্যের ছোপ আর একপোঁচ বাড়ে, "তবে ওষুধডা আছে আপনার হাতেই হুজুর।"

"কি সে ওষুধ, বলুন। চেষ্টা ক'রে দেখা যাক সেটা দেওয়া যায় কিনা।"

"অবিশ্যি যেমন ওষুধ তার দামওত' তেমনিই হবি," বলে গায়ের চাদরের অন্তরাল থেকে পাঁচশো টাকার একটা বাণ্ডিল বের করে এগিয়ে ধরে বড়মিঞা, "ইডা রাখেন হুজুর। মা লক্ষ্মী ঘরে আলি ফেরৎ দিতি নাই।"

টাকার বাণ্ডিলটার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকেন মহিমবাবু। মানুষটার স্পর্দ্ধায় তিনি হতবাক্।

যে কাজ তাঁর, তাতে সততার বালাইটাকে মুছে দিতে পারলেই অর্থভাগ্যের দরজাটা আপনি যায় খুলে। চোরাগলির লক্ষ্মী আনাচে কানাচে ফেরে; প্রবেশ পথ না পেয়ে ফিরে যায় হতাশ-ক্ষুব্ধ-মনে। তিল কুড়োবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই আপনার উপযাচকত্ব নিয়ে কারও দরজায় গিয়ে হানা দেবার। শুধু অপেক্ষায় থাকা আর ঝোপ বুঝে একটি কোপমারা। রূপোলি আলোয় ঝক্‌ঝকিয়ে উঠবে আর্থিক ভবিষ্যৎ। যেচে যেখানে পাঁচশ' আসে, চাপ দিলে তার পরিমাণ অনেকখানিই বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। অর্থের বাণ্ডিল পেরিয়ে দৃষ্টি গিয়ে পড়ে অনেক দূরের এক অতীতে। প্রবেশনার তখন মহিমবাবু। সেইসময় বলেছিলেন তাঁর মুমূর্ষু বাবা—বাবা, জীবনটাকে সৎপথেই রাখিস্। ভাগ্য খুলবে না তাতে কিন্তু বুকের বল বাড়বে। মধ্যবিত্ত জীবনে আর কোন পুঁজিই নেই ঐ এক বুকের বল ছাড়া। সে কথা বিস্মৃত হননি মহিমবাবু একটি দিনের জন্যেও। পিছল পথে পা দেবার কথা চিন্তাও করেননি কোনদিন। আজ লক্ষ্মীঠাকরুণ নিজে এসেছেন তাঁকে পরীক্ষা করতে। কিন্তু বড় অবেলায়। সময়ে যার প্রতি তিনি তাকাননি, অসময়ে সে কি আর পারবে তাঁকে টেনে নামাতে?

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান মহিমবাবু। স্থির দৃষ্টি স্থাপিত বড়মিঞার

মুখের ওপরে। এক আশ্চর্যরকম গুরু-গম্ভীর গলায় জবাব দেন তাঁর উৎকোচ-দাতাকে,"আপনি আসুন বড়মিঞা। মুকসুদ মিঞার মামলা এখন পুলিশের হাতে। আমার কিছুই করবার ক্ষমতা নেই।"

হুজুরের দেখাদেখি বড়মিঞাও উঠে দাঁড়ায়। সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছে সে এই মামলার গতি প্রকৃতি।

"আল্লা যা দেয় হাত পাতে নিতি হয় হুজুর। না নিলি আল্লা রাগ করে," অতি ধীর মোলায়েম স্বরে কথা কয়টি বলেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় সে। আর সেই অপস্রিয়মান দেহখানির দিকে তাকিয়ে নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি তাঁর নিজেরই ধারণা নেই। হঠাৎ সামনেই একটি সচল দেহের আবির্ভাবে চমকে ওঠেন, আবার ফিরে এল নাকি বড়মিঞা! ভালভাবে তাকাতে দেখতে পান, বড়মিঞা নয়, মোয়াজ্জেম দাঁড়িয়ে।

"কপাট খুলে খাড়াবেন না বাবা, শেব বারাইছে।" সাবধান করে মোয়াজ্জেম।

"দেখছি। আমার কাছেই এসেছিল।" উত্তর দেন মহিমবাবু।

কথাটা শুনে ফিরে তাকায় মোয়াজ্জেম। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মহিমবাবুর চোখের দিকে। তারপর আপন মনেই হেসে উঠে বলে, "শালার শয়তানের বাচ্চার হিসেবের জ্ঞান নাইকো। মস্জিদে মাথা ঠুকলি আল্লাতো মেলেইনা, উল্টে মাথা ফাটে খুন বারোয়।"

মোয়াজ্জেম তার হিসাব মতই কথা বলে। দীর্ঘকায় এই মানুষটিকে কখনও রোজা করতে দেখেননি তিনি। একবার সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও ক'রেছিলেন। উত্তরে আশ্চর্য হ'য়েই পাল্টা প্রশ্ন ক'রেছিল সে—"ক্যান্? কি পাপ করিছি?" এরপর আর কথা চলেনি তাঁর। শুভ্র অন্তরে যার আল্লার আসন সর্বক্ষণ পাতাই

রয়েছে, সে কেন যাবে লোক দেখান রোজা ক'রে অন্তরকে কষ্ট দিতে।

হুজুর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সে, "যাই, মা-জননীরা উদিক্ ডাকাডাকি স্নুরু করিছে," বলেই একটু নিচু হ'য়ে হাত বাড়িয়ে অন্দরের দিকে চলে যায় সে, মহিমবাবুর পাশ কাটিয়ে।

তাঁকেও যেতে হবে। মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হ'য়ে এসে বসতে হবে বারান্দায়। মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে মুকসুদ মিঞাব পূর্ব ইতিহাস কিছু শোনবার আশা আছে। কিন্তু যাব যাব ক'বেও যেতে পারেন না। পরস্পর-বিরোধী তিনটি মূর্ত্তি একেব পব এক ভেসে ওঠে তাঁর মনের পর্দার ওপরে। তার ভেতরে যেটির ঔজ্জ্বল্য বেশি সেটি মোয়াজ্জেমেব চেহাবা। যাকে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি থেকে। হ্যাঁ, তাড়িয়েই দিয়েছিলেন বৈকি। যদিও স্পষ্ট ক'রে বলেননি সে কথা। তবুও স্পর্শকাতর মানুষটাব মনে যে আঘাত দিয়েছিলেন তাতে সবে যাওয়া ছাড়া আব কোনও উপায় ছিল না তার। আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে ডেকেও এনেছিলেন তাকে তার বাড়ি থেকে। পুত্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় অপারক পিতার সেই ব্যথা-কাতর মুখখানিই আজ এতদিন পরে আবার মনে পড়ে তাঁর। ভুল হ'য়ে যায় বাড়ির ভেতরে যাওয়ার কথা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন দরজাটির ধারে খেয়াল নেই তাঁর। হটাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তির আগমনে সচকিত হ'য়ে ওঠেন। গো-সেবার পালা শেষ ক'রে মুড়ির কাঠা হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে মোয়াজ্জেম। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে চলে যান মহিমবাবু।

একটু পরেই ফিরে এসে মাদুর পেতে বসে পড়েন বারান্দার ওপরে। দেখেন একটি একটি ক'রে মুড়ি টিপে গুঁড়ো করছে বসে

মানুষটা। খাচ্ছে না। পাশে একটা খালি কলাই করা কাপ। 'হাঁ' ক'রে আছে যেন কিসের প্রত্যাশায়। কাপটার দিকে নজর পড়তেই মুড়ি টেপবার কারণটা সহজ হয়ে যায়। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে চা'য়ে মন মজেছে মোয়াজ্জেমের। তারই অভাবে উস্‌খুস্ করছে। বলতে পারছে না মুখ ফুটে, লজ্জার প্রতিবন্ধকতায়।

"আসছে। আজ গরু দুইতে একটু দেরি হল কিনা।" আশ্বস্ত করেন তিনি চায়ের নতুন ভক্তকে।

"শের দেখে একটু আবডাল দিছিলাম। ওনার অসাধ্যি কম্ম নাই। দুই দুডো সোমসারকে ও একাই শেষ করল। উদ্ধৃত ক'রে যেতে থাকে মোয়াজ্জেম এক অতীত কাহিনী। জানেন না মহিমবাবু, মানব মনের নতুন কোন দিকের হদিস্ মিলবে কিনা এর ভেতরে। তবু্ও মন-সাগরের কুল খোঁজা যার স্বভাব, ধৈর্যও তার ঐ সাগরের মতই অসীম।

লোকে বলে—মাটি, না বার-সোহাগী। সতীত্বের বড়াই নেই। দাপ দেখলেই ভুলে যায়। নিঃশেষে দান ক'রে বসে নিজেকে। তেমনি ভাবেই ক' বিঘা জমি ভোগ্যা হ'য়েছিল বড়মিঞার।

দক্ষিণের চর। এককালে নাকি পয়োস্থি শিখোস্থির কারবারি ছিল কুমার নদীর। মাথাভাঙা থেকে জন্ম নিয়ে গড়াইএর বুকে বিলীন হ'য়ে যাওয়ার পথে খল্ খল্ ক'রে হাসতে হাসতে খুবলে খুবলে খেয়ে নিত পাড়ের মাটি। ধীরে ধীরে গ্রাস ক'রে ফেলত মাঠের পর মাঠ। তারপর মনের আনন্দে নূতন পথরেখার ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে ওপারের কথা যেত ভুলে। ফলে ওধারে জমে উঠত অবহেলার পলি। জাগত চর। এপারের চাষী ঘর ভেঙে নৌকায় ক'রে নিয়ে গিয়ে উঠত ওপারে। চরের চাষী। ঘর ভাঙা আর ঘর গড়া তার কপালের লিখন। তারপর হঠাৎ কিসের খেয়ালে এই ভাঙাগড়ার খেলা শেষ ক'রে দিল কুমার।

সেই যে দক্ষিণের চর জাগল আর পয়োস্থি হ'ল না তার। ক্রমে বসতি হ'ল ঘন। আবাদী জমির হ'ল পাকাপাকি বন্দোবস্ত। সেই চরেরই কিছুটা জমি ছিল ইসমাইলের। মথুরাপুরের জমিদার বিনায়ক রায় চৌধুরীর কাছ থেকে ডোল করিয়ে নেওয়া। অশেষ গুণে গুণী ইসমাইল। এই দামাদকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না মুকস্‌দ মিঞার। কিন্তু বলতেও পারত না কিছু। বৎসরের ভেতরে একটি দিনও দেখা পাওয়া যায় না যার, তাকে আর কি ক'রে কিছু বলা যায়?

"অচথ, বড়মিঞার বাড়ি পেত্যেক রোজই আসতো সে। মিঞা নাকি ওর পরাণের দোস্ত," ব'লে তার স্বভাবানুযায়ী থেমে যায় মোয়াজ্জেম। দৃষ্টি তার কোন এক অতীতের ইতিহাস পাঠে রত। কোমল নয়, জ্বালাধরা ইতিহাস। প্রতিফলন তার পাঠকের মুখে চোখে। শব্দের কম্পন নেই বারন্দার এই বাতাসটুকুর বুকে। স্থির দুটি মনুষ্যদেহে প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার সামান্য ওঠা নামাটুকুও বুঝি বোঝা যায় না। একটু একটু ক'রে কেটে যায় প্রায় দু'মিনিট সময়। তারপরই একটা ঝাঁকি দিয়ে যেন ইসমাইলকে লক্ষ্য করেই বলে ওঠে সুদূর অতীতের সেই ইতিহাসের পাঠক, "কিন্তুক্ ঐ দোস্তই তো তোক্ শেষ করল। কনে হ'ল ডাকাতি আর তুই পড়লি ধরা।"

"ইসমাইল কি ডাকাতি করত নাকি?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"ছিল ঐ দলে। কিন্তুক্ যিদিনকার কথা, সিদিন ও বাড়ির থিকেই বারোয় নাই। হামিদার অসুক ছিলত', তাই ওর হাত জড়ায়ে ধরে কইছিল—আজ আর বায়রা যায়ো না। আমার শরীলডা য্যান ক্যামন ক্যামন করে।"

"হামিদা বুঝি ইসমাইলের স্ত্রী?"

"জী, ইসমাইলের বিবি আর আমার খালার মিয়ে।"

"তোমার বোন হয় তাহ'লে ?"

"জী" বলে আবার একটু এগিয়ে যায় মোয়াজ্জেম, "সেই রাত্তিরে কুত্থাও বারোয় নাই ইসমাইল, তবো ঐ বড়মিঞার চক্কান্তরে পড়ে জেলে যাতি হল তাক্। আর তারপড়ডাতেই দেখা গেল দক্ষিণের চরে ইসমাইলের জমিটুকু চলে গেছে বড়মিঞার গব্বে।"

থেমে যায় সে। মানুষের পায়ের ছাপে ইতিহাসের পৃষ্ঠাখানা হ'য়ে গিয়েছে অস্পষ্ট। তীক্ষ্ণ সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে করতে হয় তার পাঠোদ্ধার। কখন কখনও বা জড়িয়ে যায় ছোট বড় নানা ঘটনার আগাছায়।

"তাবো বাবা" হঠাৎ মহিমবাবুর এদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে মোয়াজ্জেম, "একজনা ছিল যে আসে ঐ রাক্কোসের সামনায় রাজপুত্তুরের মতন বুকটান ক'রে দাঁড়াতি পারত।" বেশ জোরের সঙ্গেই আরম্ভ করেছিল মোয়াজ্জেম। কিন্তু থাকে না আর সে জোর। নিস্তেজ মিইয়ে যাওয়া গলায় শেষ করে তার কথা, "কিন্তুক্ সে তো তখোন জেলখানায়। সন ১৯০৫ সালে বাংলাক্ দুইভাগ করা নিয়ে যে তুল-তামাল কাণ্ড হ'ল তাইতেই জেল হ'য়ে গেল সেনবাবুর। তারপরডাতেই এই কাণ্ড।" বলে যেতে থাকে সে এ তল্লাটের এক পুরাতন কাহিনী। মেঘনাদ বধের ঘটনা শোনাতে ধরতাই নিয়েছে দস্যু রত্নাকরের ইতিহাস থেকে। এ ইতিহাস গড়িয়ে গড়িয়ে কখন এসে পৌঁছুবে আসল বক্তব্যে, কে জানে।

জেল থেকে খালাস পেল প্রতুল সেন ১৯১১ সালে, সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের পর। বঙ্গ ভঙ্গ আইন রদত' হ'লই উপরন্তু মুক্তির আদেশ হ'ল এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে যারা কারাবরণ করেছিল, তাদেরও। আর সেই সালেই জমিদার বিনায়ক রায়চৌধুরী দক্ষিণ চরের ১৫ বিঘা জমি দান করেন প্রতুল সেনকে।

প্রতুল সেন আর সামসুল হুদা দুই বন্ধু। দুই জনই যেন তেলে জলে পাকান বেতের লাঠি। হাব ভাব দেখে বোঝা যায়না যে ওরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। সেই সামসুল ছিল মুকসুদ মিঞার বড় দামাদ। দু'জনের বাড়ি একই গাঁয়ে। আর এই জামাইটিকে নিয়েই ছিল শ্বশুরের বেশি চিন্তা। সামসুলের ছিল লড়ুয়ে মন। যেটাকে ভাল মনে করত তার জন্যে জান দিয়ে লড়াই করতে পিছপা হত না। মুকসুদ নিরীহ শান্তিবাদী মানুষ। এড়িয়ে চলতে চায় ঝামেলার আক্রমণকে। কিন্তু দূরে থাকব বললেই থাকা যায় না। সমাজ সংসার নিয়ে কথা। জামাই তোলে ঝড়ো বাতাস, ঝাপটা এসে লাগে শ্বশুরের গায়ে। ভয়ে সিঁটিয়ে ওঠে মুকসুদ মিঞা। সামসুলকে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করে, এ ভাবে জান দেওয়ার কোন মানে হয় না। প্রতুলের ভাষাতে উত্তর দেয় সামসুল—জান যাওয়ার জন্যেই, থাকবার জন্যে নয়। ঘরে বসে থাকলে চাল ভেঙ্গে মাথায় পড়বে, আসমানেব নিচে থাকলে বাজ আসবে নেমে। অতএব ভয়ের কোন কারণই নেই। দামাদের কথা শুনে আর বড় মেয়ে খাদিজার ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হয়ে ওঠে মুকসুদ। দিশাহারা বৃদ্ধের অন্তব ভেদ করে বেরিয়ে আসে একটি শব্দ—"আল্লা!"

"সেই সামসুলও ত্যাখোন গা আবডাল দিয়ে রয়ছে। ও-তো ঐ সেনবাবুরই সাকরেদ। একই আইনের আসামী। তাই সেনবাবুর ধরা পড়ার কথা শুনেই দিল পিট্টান। মোক্ষম দুই সক্সো নাই গেরামে। সলোক বুঝে কোপ ঝাড়ল বড়মিঞা।"

স্বল্পভাষী মানুষটার মুখ খুলেছে আজ। নিরুপায়তার যে খেদ জ্বালা হয়ে নিরন্তর জ্বলছিল তার অন্তরে, তারই উপশম করবার চেষ্টা করে সে একজন বিচক্ষণ শ্রোতার কাছে প্রকাশ ক'রে।

ইসমাইলের জমিতে বড়মিঞা লাঙল বসিয়েছে শুনেই হামিদা ছুটে এসেছিল মোয়াজ্জেমের কাছে। জানত কিছু হবে না চেষ্টা

ক'রে, তবুও একবার বড়মিঞার কাছে গিয়েছিল মোয়াজ্জেম। তার কথার উত্তরে বড়মিঞা একটা দলিল বের ক'রে দিয়ে বলেছিল—'ধারের ট্যাকাডা ফ্যালায়ে দাও, আমিও জমিন্ ছাড়ে দি।'

এ কথার পর আর কোনও কথা আসেনি মোয়াজ্জেমের মুখে। নিজে সে অর্থহীন। প্রমাণও অনেক দূরের রাস্তায়। পর পর ছ'তিনখানা চিঠি গেল বটে ইসমাইলের কাছে। কিন্তু অনেক ঘুরে ফিরে উত্তর যখন এল, তখন যা ঘটবার তা ঘটে গিয়েছে।

"কি লিখেছিল ইসমাইল?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"চার পাতার এক রামফর্দ্দ, উত্তর দেয় মোয়াজ্জেম, "তার মধ্যি আসোল কথা হচ্ছে—আজান শেখ ডাকাতি ক'রে কক্ষণো বাড়ি যাতো না। সুজা চলে আসতো বড়মিঞার কাছে। মিঞার বিবি নাকি আজানের দূব সম্পোক্কের বু হয়। বু'র বাড়ি কয়েকদিন থাকে, চারদিক ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলি, তয়গে বাড়ি ফিরত। সিদিনও তেমনি আইছিল আজান। কিন্তুক্ মিঞা অজুহাত ছাখায়ে একটা রাত্তিরের মতোন্ তাক্ পাঠায়ে দেয় ইসমাইলের বাড়ি। আব ভোব না হতিই পুলিশ আসে ঘিরে ফেলল চারদিক। ডাকাতি করা মাল, ডাকাত সবই পাওয়া গেল।" একটু দম নিয়ে বলে মোয়াজ্জেম, "এই হ'ল আপনার গিয়ে ইসমাইলের জেলে যাওয়ার ব্যাপার। আর ধাবের সোম্মন্ধে লিখিছিল যে সে বড়-মিঞার কাছ থিকে কিছুই ধার করে নাই। যাক্ তারপর শোনেন—"

ধানেব দুধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে জৈষ্ঠে। আষাঢ়ে তার বরণ হ'ল সোনার। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে খেলতে থাকে বাতাসের সঙ্গে। দেখে বুক ভরে যায় চাষীব! শুধু হামিদার ঘরের বাতাস দীর্ঘশ্বাসে ভরা। এই সময় দু'দিক থেকে দুটো খবর এল। মথুরাপুরের খবর—

সামসুল হঠাৎ কোথা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে গ্রামে। দক্ষিণ চরের খবর, শুয়োর পড়েছে ধান ক্ষেতে। খবর শুনেই বন্দুক হাতে বের হয় বড়মিঞা। সকাল, সন্ধ্যা দু'বেলাই দেখা যায় তাকে বন্দুক হাতে চষে বেড়াচ্ছে অতবড় চরের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো। ওদিকে সামসুলও শুনেছে ইসমাইলের জমির খবর। শুনেই ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে ইসমাইলের জমির ওপরে। হাতে এক বাণ্ডিল সড়কি।

শক্ত সিকিম একহারা চেহারা। কাপড়খানা হাঁটুর কাছে পর্যন্ত তোলা। মাজায় বাঁধা একখানা গামছা। এসে যখন দাঁড়াল ইসমাইলের জমিতে তখন আশে পাশের জমি থেকে শুধু তাকিয়ে দেখল অন্যান্য চাষীরা। তাদের ধারণা শুয়োর মারতে এসেছে সামসুল। উৎপাত বেড়েছে ক'দিন থেকে। বড়মিঞারও টহল দেওয়ার অন্ত নেই। কিন্তু একটা কথা ঠিক বোধগম্য হয়না তাদের। দাঁতাল শুয়োর মারতে সামসুল সড়কির বাণ্ডিল নিয়ে এল কেন? এত' ঐ জন্তুটার গায়ে সজারুর কাঁটার মতই বিঁধবে। ফালা না হ'লে ঐ রকম শক্ত চামড়ার জন্তু মারা যায় কখন?

এই পর্যন্ত বলেই আবার থামে মোয়াজ্জেম। এ থামা যে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া নয়, তা বক্তা এবং শ্রোতা দু'জনেরই জানা। কাহিনীর গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করবার এ এক প্রস্তুতি শুধু। অস্থায়ীর শেষে অন্তরায় প্রবেশের মুখে একবার শুধু দেখে নেওয়া, মনের তার ঠিক ঘাটে ঘাটে বাঁধা আছে কিনা। সুরের তারতম্যে বিশেষ কাহিনীও তার বিশেষত্বটুকু ফেলে হারিয়ে, আবার অতি সাধারণ ঘটনাও পায় মৌলিকত্ব।

মোয়াজ্জেম কথা বলে কম। কিন্তু যখন বলে, বিরতি দিয়ে দিয়ে, পর্দায় পর্দায় আরোহণ অবরোহণে সুখ-শ্রাব্য ক'রে তোলে তার বক্তব্য। সেই নিয়ম অনুযায়ীই থামে সে সামসুলের কাহিনীর দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভের অবকাশে।

কিন্তু আরম্ভ আর করতে হয় না। একখানা রঙ্গীন কাগজ হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে ইমামুদ্দীন। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই বলে ওঠেন মহিমবাবু, "ওকে? ইমাম না?"

"হ' তাইত' দেখি। কাঁদে য্যান!" একটু আশ্চর্য হ'লেও ব্যস্ত হয়না মোয়াজ্জেম।

"যাও, দেখ কি হ'ল।"

"আসুক, দেখি।" উঠে দাঁড়াবারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনা সে।

সত্যিই কাঁদছে ইমাম। বেশ জোরে শব্দ করেই। ছুটতে ছুটতে এসে বা-জানকে জড়িয়ে ধরে আরও জোরে কাঁদতে থাকে সে।

"কি, হইছে কি বলবিতো? না, কাঁদবিই শুধু?"

বা-জানের কথাব উত্তরে কান্নার বেগ আরও বেড়ে যায় ইমামেব। কি একটা কথা যেন সে বলতে চায়, অথচ বলতে পারছেনা মুখ ফুটে।

"ওর হাতে কি ওটা দেখ না।" তাড়া দিয়ে ওঠেন মহিমবাবু।

কাগজখানা ইমামের হাত থেকে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে মহিমব৷বুর হাতে তুলে দেয় মোয়াজ্জেম—"ছাখেনতো বাবা, কি কয়।"

হাতে নিয়েই বোঝেন মহিমবাবু, একখানা টেলিগ্রাম। তাড়াতাড়ি ক'রে চোখ বুলিয়ে গিয়ে আর কথা সরেনা তাঁর মুখে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মোয়াজ্জেমের মুখের দিকে।

"কি হ'ল বাবা? কন কি লেখা আছে? ছেলেডা কাঁদে ক্যান জানতি হবিতো?"

"এক কাজ—" মোয়াজ্জেমের কথার উত্তরে বলতে গিয়েই থেমে যান তিনি। বলবার কথাটি ঘুরিয়ে বলে ওঠেন—"তুমি বাড়ি যাও।" এর বেশি আর বলা আসেনা তাঁর।

"কি যে কন? এ্যাখোন বাড়ি যাব ক্যান্? গাইদুটোর জান্য—"

"থাক গাই। তুমি যাও। খবর ভাল না।" একটুখানি ইসারা দিতে চেষ্টা করেন তিনি।

"কি খাপোর, তা কবেন তো? কলকাতা থিকে আইছে?"

"হ্যাঁ।"

"মহীর খপোর?" বলে একটু থেমে নিজেই প্রশ্ন করে মোয়াজ্জেম, "সে বাঁচে নাই, এইত' কয়?"

যত সহজে মোয়াজ্জেম উচ্চারণ করে তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ তত সহজে মহিমবাবু 'হ্যাঁ' শব্দটিও সৃষ্টি করতে পারেন না তাঁর গলায়। শুধু বলেন, "তুমি বাড়ি যাও।"

"তা কাঁদিস ক্যান্, এ্যাঁ?" ইমামের কাঁধটা ধরে একটা ঝাঁকি দেয় মোয়াজ্জেম।

আর ভয়ে কাঁপতে থাকে মহিমবাবুর বুক। পঞ্চাশোত্তর বয়সের এই প্রৌঢ়টি কিই বা করে বসে, কে বা জানে। তার চাইতে কাঁদুক। কেঁদে হাল্কা করুক বুকের ওপরকার পাষাণ চাপ। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে গায়ে হাত রাখেন তিনি। তাঁর মুখের দিকে একবার তাকায় মোয়াজ্জেম। এ সান্ত্বনার ইঙ্গিত সে বোঝে। তারপর দূর কলকাতার দিকে তার সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি মেলে বলে—"আসার সোময় বৌ ক'ল—কয়ডা পান্তা আছে, খায়ে যাও। তা খায়ে আলাম।"

"মোয়াজ্জম, মোয়াজ্জেম," তার কাঁধ দুটি ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকি দিতে থাকেন মহিমবাবু। মানুষটা কি পাগল হ'য়ে গেল শেষে! "এই ইমাম, দৌড়ে যা, বাড়ির ভেতর থেকে জল নি'আয়।"

যেতে গিয়েও যেতে পারে না ইমাম। শক্তমুঠিতে তার হাত ধরে রয়েছে বা-জান।

"রাস্তায় আসতি গুন্ গুন্ ক'রে একটা কি গানও গাচ্ছিলাম," বলে আবার তাকায় মহিমবাবুর মুখের দিকে, বলে—"আমার মনে রয়ছে ফুর্তি। মহীর কিছু হলি থাকতো তা?" শেষের কথাটা একটু জোর দিয়ে বলেই থেমে যায় সে। তারপরই সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলবাব মত ঝাঁকি দিয়ে বলে ওঠে সে—"উসব কোন জানুয়ারের কীর্তি।"

যাক্, পাগল হ'য়ে যায়নি তাহ'লে মানুষটা! অপরিসীম ভয়ের স্বেদ-ধারা এখনও বয়ে চলেছে তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে। এ কী ধরণের উল্টোপাল্টা কথা? পরিচিত চল্‌নার ওপরে মাঝে মাঝে টেনে আনে এমন এক একটি আবরণ যা মুহূর্তে লোপ পাইয়ে দেয় তার পরিচয়ের সংগা।

"তাহ'ক তুমি একবার বাড়ি যাও। আর দেখ, কালকের ডাকগাড়িতে কলকাতায়—"

"কি যে কন বাবা?" তাঁকে আর বলতে দেয়না মোয়াজ্জেম, "আলাং ফালাং কতকগুলো খরোচ করলিই হ'ল?"

"খরচেব জন্যে তোমাকে ভাবতে হবেনা," ধমক দিয়ে ওঠেন মহিমবাবু, "যা ইমাম, বাপকে বাড়ি নিয়ে যা। আমি পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে বলে রাখব। কালকেই যেতে হবে।"

ঠেলেঠুলেই একরকম তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন সিঁড়িটার ওপরে।

ঘোড়ার গাড়িতে ক'রেই ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা। কোর্ট-চাঁদপুর থেকে ডাক নিয়ে এসে থামে খালিশপুরে। সেখান থেকে ডাক বোঝাই ক'রে চলতে থাকে মাঝদিয়ার দিকে, পথের আরও গোটা দুই ডাকঘরের ভার লাঘব ক'রতে ক'রতে। সেই ডাকগাড়িতেই মোয়াজ্জেমের যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন মহিমবাবু। নিজেও একটু সকাল সকালই বেরিয়েছেন বাড়ি থেকে।

মানুষটাকে রওনা ক'রে দিয়ে এখান থেকেই সোজা চলে যাবেন এজলাসে।

ঠিক সময়েই এসে দাঁড়ায় মোয়াজ্জেম। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারেন মহিমবাবু, বাইরে যত শক্ত হ'য়েই থাকুক না কেন, অন্তর তার ফেটে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যান তিনি। বলেন, "সাবধানে থেক মোয়াজ্জেম। এখানে অনেকে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।"

"মিছেমিছি কয়ডা ট্যাকা যাবি আপনার। আমিত' যাতি চাইনে। কিন্তুক্ ঐ মিয়েছেলেগুলোন্ এ্যামুন—সারারাত্তির কাঁদে কাঁদে আমাক্ একটু ফুটা ঘুমোতি দেয় নাই। চোখ য্যান জড়ায়ে আসে," বলতে বলতে একটা বিরাট হাই তুলে গাড়োয়ানের পাশে উঠে বসে সে, "নে' ভাই, চল্। বাবার ট্যাকায় ক'লকাতার সহোরডা দেহে আসি।"

পিঠে চাবুকের ইঙ্গিত পেয়ে হ্যাঁচ্কা টান মেরে এগিয়ে যায় ঘোড়া দুটি। ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে গাড়ি। আর ঠায় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন মহিমবাবু, এ মানুষকে সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা কি মানুষের আছে? যে খেয়ালী কারিগরের খেয়ালে সৃষ্ট এর চরিত্রের ধারা সেই জানে এর সান্ত্বনা কি।

মাঝের একটা দিন বাদ দিয়ে তৃতীয় দিনে ডাকগাড়ি থেকে নেমে ধূলোপায়েই এসে দাঁড়ায় মোয়াজ্জেম। সঙ্গে পুত্র মহীযুদ্দীন। সেদিকে তাকিয়ে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু। বলতে চান অনেক কিছু। ভাষা জোগায় না মুখে। পিতৃস্নেহ কি জিনিষ, এই স্বল্প-শিক্ষিত মানুষটি আজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিখিয়ে দিল তাঁকে। অদৃষ্ট-পূর্ব এ চরিত্র স্মরণ যোগ্য। অপূর্ব এর মৌলিকত্ব।

"যাই বাবা, মিয়েছেলেগুলেন্ চোখে না দেখলিত' বিশ্বেস করবিনে—"

চলে যায় তারা তাদের এই পরম বন্ধুটিকে আদাব জানিয়ে। আর মহিমবাবু ভাবতে থাকেন—এ কোন রহস্য? কে এমন কাজটি করল?

তখনকাব মত চলে গেলেও ফিরে আসতে হয় মোয়াজ্জেমকে ঘণ্টাখানেক পরেই। একা নয়, মহীযুদ্দীন সঙ্গে। মহিমবাবু তখন বাড়ির ভেতরকার উঠোনে লাগান ফুলগাছগুলির গোড়া নিড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় বাইরে থেকে দরাজ গলার ডাক শোনা যায়—"বাবা—"

শুধু মহিমবাবু নন, লক্ষ্মীদেবীও জানেন এ ডাক কার। বারান্দাব ও।:ব বসে তবকারী কুটতে কুটতে বলে ওঠেন তিনি, "ঐ যে, তোমাব ছেলে এসেছে।"

কথাটাব সুরে প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গ। এড়িয়ে যায় না মহিমবাবুর শ্রবণেন্দ্রিয়। একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নেন তিনি। বলেন, "আমাব ছেলে যদি ওব গুণগুলি পায় তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান বাপ বলেই মনে কবব।"

আর দাঁড়ান না সেখানে। বাইরের ঘরের ভেতর দিয়ে গিয়ে দাঁড়ান ওপাশেব বারান্দায়। বাপ বেটাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করেন—"আবার কি ব্যাপার?"

উত্তরে কি একটা কথা বলতে যায় মোয়াজ্জেম। তার আগেই বলে ওঠে মহীযুদ্দীন, "আমি বলি বা-জান্।"

"আচ্ছা বল্।"

বা-জানের অনুমতি পেয়ে নালিশ জানায় মহী তার বাপের বিরুদ্ধে। বহুকষ্ট ক'রে বা-জান তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। এখন সে একটা চাকরীও পেয়েছে ক'লকাতায়। সেই চাকরীর

টাকা থেকেই বা-জানের জন্যে কিনে এনেছে এক জোড়া জুতো, একজোড়া ভাল ধুতি আর জামা। তার বড় সাধ, বা-জান এগুলি পরে। কিন্তু সে একটিও পরতে রাজী নয়। এখন মহিমবাবু যদি বুঝিয়ে বলেন তার বা-জানকে—

"কেন পরব না, এ্যা বাবা?" ছেলের নালিশের শেষে এসে বলে ওঠে মোয়াজ্জেম, "ছাওয়াল আমার উপযুক্ত হয়ছে, রোজগার করতিছে। তার দিয়া জিনিস আমি মাথায় করে নেব।" বলে থেমে যায় সে। তার কথা বলবার সেই চিরাচরিত ভঙ্গী। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। মনে হয় যেন খাপছাড়া ভাবে ইতি ক'রে দিল তার কথার। কিন্তু ইতি যে হয়নি তা বোঝা যায় একটু পরেই, যখন সে আবার একটা ঝাঁকি দিয়ে পূর্ব কথার জের টানতে স্বুরু করে।

"কিন্তক্" সেইভাবে ঝাঁকি দিয়ে আবার বলতে থাকে সে, "এট্টা কথা বাবা, ছাওয়ালেক্ আমার কথা দিতি হবি, এই যে জামা জুতো আমি পরব, এ আর আমি খুলব না।"

কথাটা ঠিক বোধগম্য হয়না মহিমবাবুর। কি বলতে চাইছে সে? ছেলে এত সাধ ক'রে বাপের জন্য যে জিনিসগুলি নিয়ে এল সেগুলি ব্যবহার করবার ভেতরে এত প্রশ্ন তার কিসের?

"আমি চাষাভুষো মানুষ। জীবন কাটালাম দিনমজুরের কাম করে আর বাবার গরুগুলোর সেবা ক'রে," যেন মহিমবাবুর না বলা প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে মোয়াজ্জেম, "আট হাতের বড় কাপুড় জোটে নাই, জুতো তো দূরির কথা। সাত গাঁয়ের মানুষ জানে মোয়াজ্জেম মজুরী খাটে খায়। আজ ঐ কাপুড় আর জুতো পরে বাবু যে সাজব, কাল যদি আর না দিতি পারিস তুই? ত্যাখোনতো আবার সেই আটহাত আর খালি পা? লোকে বলবি—কিরে মোয়াজ্জেম, বাবু সাজা তোর শ্যাষ হয়ে গেল? তাই বলতিছিলাম বাবা, ঐ কাপুড় আর জুতো আমি পরব, কিন্তক,

তার আগি ছাওয়ালেক কথা দিতি হবি যে ও আর আমাক্ খুলতি হবিনে।”

বড় ভীষণ প্রতিজ্ঞা। মহিমবাবু জানেন, এ শুধু মুখের কথা নয় মোয়াজ্জেমের, এ তার আদর্শ। ভেঙ্গে যাবে কিন্তু মাথা নোয়াবে না। তাই এ বিষয়ে মহীকে কোন সাহায্যই করতে পারেন না তিনি। মহীয়ুদ্দীনেরও সাহস নেই অতবড় একটি জবান্ দেবার। তাই বলে একটি দিনের জন্যও বা-জান তার কেন পাবে না এই সাধ ক'রে কিনে আনা কাপড় জামা। মনের আস্বাদ নিতে গিয়ে বুঝতে পারেন মহিমবাবু কোথায় যেন একটু সুর কেটে যাচ্ছে। স্নেহ আর সম্মানের অন্তরালে সামান্য একটু তিক্ততার আভাস। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন তিনি, “বস দেখি, বস তোমরা। চা খেয়ে শরীরটা ঝরঝরে ক'রে নাও, তারপর বাড়ি যাবে।” বাড়ির ভেতরে চলে যান মহিমবাবু। একটু পরে ফিরে আসতেই দেখেন অতিথির সংখ্যা গিয়েছে বেড়ে। অনাথ ঘোষ এসেছে। মানুষটার সব সময়েই কর্মব্যস্ত ভাব। এখানকার এই কয়েক বৎসরের জীবনে বহুবারই দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। দেখা হ'তেই নমস্কার ক'রে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, হড়বড় ক'রে তার সময়াভাবের একটা কৈফিয়ৎ দিয়েই কেটে পড়েছে। সেই মানুষ আজ তাঁরই বারান্দায় এসে বসেছে দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে যান তিনি।

“অনাথবাবুর জন্যে একটু চা আনতে বলি ?” জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

“আজ্ঞে ভাত না হলিও চলে,” উত্তর দেয় অনাথ ঘোষ।

“চা না হলে চলে না,” বলে হাসতে হাসতে বাড়ির ভেতরে গিয়ে আর এককাপ চা বেশি করবার কথা বলে আসেন মহিমবাবু। তিনি ফিরে আসতেই বলে ওঠে অনাথ ঘোষ, “না হলি যে চলেনা তা নয়, তবে কথা হচ্ছে আমাগরের ভাতের পাট থাকে ছিকেয়

তোলা। ভগোমান কখন মাপাবি তার ঠিক নাই কিছু। তাই কয় ফোটা চা প্যাটে পড়লি মনডা একটু—"

মোয়াজ্জেম স্বভাব গম্ভীর মানুষ। বক্‌বকানি ধাতস্থ হয় না তার। বলে ওঠে—"একবার যদি আরম্ভন্ করল—"

"ফকির হয়ে জঙ্গলে যাও," মোয়াজ্জেমের কথার মুখে থাবা মারে অনাথ ঘোষ, "তুই কলোম কৈফিয়ৎ লিখে তুই সের চাল, তুই পয়সার তেল, এক পয়সার তরকারী, এক পয়সার নুন, এক পুয়া ডাল আর কয়ডা চুনোপুঁঠি নিয়ে বাড়ী যাবা। আমার কৈফিয়তে তো আর চার আনা আসবিনা। উল্টে কয়ে বসবিনি—যাও যাও, আর কৈফিয়তে কাম নাই।"

হাসি পেলেও হাসা যায় না সব সময়। পদমর্যাদা বলে একটা কথা আছে। অদৃশ্য ঐ জিনিসটিকে অনেক যত্নে রক্ষা করতে হয়। বড়জোর ঠোঁটদুটিকে একটু বিস্তার করা চলে। মহিমবাবুর অবস্থা আরও খারাপ। ঠোঁটদুটিকে সামান্য প্রশ্রয় দিতে গেলে হয়ত' ফেটে পড়বে তা। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করেন "অনাথবাবু, মোয়াজ্জেমের সঙ্গে শত্রুতা আছে কারও?"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তব পাওয়া যায়—"ছিল না। হইছে একজন।"

"কে?"

"বড়মিঞা। দোষটা ইয়েরই ষোল আনা। অতবড় মিঞা সাহেব ক'ল একটা কথা; শুনলি কি হ'ত?"

"কি, শুনবি কি?" চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে জ্বলে ওঠে মোয়াজ্জেমের, তারপরই ফিরে আসে পূর্বাবস্থায়, "ছাড়ান দ্যাও উসব কথা। ন্যাও, চা খাও।"

খোকন কয়টি বাটি থালার ওপরে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। মোয়াজ্জেম তার কাপে একটা বাটির চা ঢেলে নিয়ে মহীযুদ্দীনকে দেয়। অনাথও তুলে নিয়েছে একটি বাটি। অপেক্ষা করতে

থাকেন মহিমবাবু। মহীর চা খাওয়া হয়ে যেতে কাপটা নিয়ে আর একবাটি চা সেটাতে ঢেলে নেয় তার বাপ।

"বড়োমিঞাত' কইছিলই হুজুরের বাড়ি আসোনা তুমি। তা আসো ক্যান?" খালি বাটিটা একপাশে রেখে দিয়ে বলে ওঠে অনাথ ঘোষ।

"কি ব্যাপার অনাথবাবু?" কথাটা জানা ছিল না মহিমবাবুর। মোয়াজ্জেমও কিছু বলেনি তাঁকে। তাই আনুপূর্বিক ঘটনাটি শুনতে চান তিনি। অনাথ ঘোষও জমে ওঠে গল্পে। কিন্তু তার কথা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই উঠে দাঁড়ায় মোয়াজ্জেম।

"এ্যাখোন যাই বাবা, ঐ বেলা আসবানে," বলে খালি কাপটা ধুয়ে তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় রেখে মহীকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। সেদিকে একবার তাকিয়ে হেসে ফেলে অনাথ ঘোষ। 'পালালো' বলে ক'দিন পূর্বের এক ঘটনার কথা শোনাতে থাকে সে।

সভা বসেছিল ওয়ালেৎ হোসেনের বাড়ীতে। আর সেই সভায় আহূত হয়েছিল মোয়াজ্জেম। জানে না সে, এ আহ্বানের অন্তর্নিহিত কারণটি কি। তাহ'লেও 'না' বলে না সে। নির্দিষ্ট সময়েই গিয়ে দাঁড়ায় সভার মাঝখানে। জানায় আদাব। যদিও এই কাজটিতে প্রাণ পায় না সে। এ যেন সভাস্থলে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করা—আমি তোমাদেরই দয়ার ওপরে নির্ভরশী.. এক দীন হীন প্রাণী। ভাল লাগেনা তার এ আদাবের রীতিকে। জীবে জীবন যোগ হয়না এতে। যা হয় তা হচ্ছে অন্তরকে বিক্ষুব্ধ ক'রে আরও বিরূপ ক'রে তোলা। দায়সারা কাজটি শেষ ক'রেই জিজ্ঞাসা করে সে, "ডাকিছিলেন বড়মিঞা?"

উত্তরটা এক কথায় হয় না। বড়োমিঞা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে যেতে থাকে মোয়াজ্জেম আর তার পুত্রদের চরিত্র-গাথা। বাপের সততা, পুত্রদের শিক্ষা দিবরাজপুরের অহঙ্কার করবার বিষয়। বুঝে পায়না মোয়াজ্জেম এ কিসের সভায় এসে দাঁড়িয়েছে

সে। হঠাৎ এত প্রশংসাবাদই বা কেন? প্রথমদিকে একটু হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই অন্তরের প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সে বড়োমিঞার শেষ বক্তব্যের।

সুখ্যাতির পালাগানের শেষ হয় একসময়। এবারে আসল বিষয়। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মোয়াজ্জেম বক্তার মুখের দিকে।

"কিন্তুক্, একটা গুণাহ্ এ্যামোন রোশনাইটাক্ ঢাকে ফেলাইছে।" বলে একটু থামে বড়োমিঞা, তারপর আবার আরম্ভ করে, "অ্যাদ্দিন মিঞা সাহেবের অবোস্থা পড়ে ছিল, সম্-সার চালাতি কষ্ট হ'ত, ত্যাদ্দিনের কথা না হয় ছাড়ান দেওয়া যায়। এ্যাখোন তো আর তা নাই। জুয়ান মদ্দ ছেলে রুজগার করতিছে। তয় এ্যাখুনও ক্যান মিঞা সায়েব এক হিঁদুর বাড়ি পড়ে থাকে? হিঁদুর বাড়ি ভাত খায়?" স্বরে স্পষ্ট উত্তেজনা ওয়ালেৎ হোসেনের।

"আপনের বলা হইছে বড়োমিঞা?" ধীর শান্ত গলা মোয়াজ্জেমের।

কথা শেষ হয়নি বড়মিঞার। অভিযুক্তকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলবার চেষ্টা করে সে তার অনূঢ়া কন্যার সাদীর কথা তুলে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সঙ্কুচিত হয় না মোয়াজ্জেম। পূর্বের মতই আবার জিজ্ঞাসা করে—"কথা শেষ হয়ছে আপনের?"

"হাঁ, তাত' একরকম হ'লই, কি কন আপনেরা?" সভাস্থ সকলের মুখের দিকে তাকায় বড়মিঞা। এতক্ষণে উত্তর দেবার প্রস্তুতিতে ঋজু হয়ে উঠেছে মোয়াজ্জেমের দেহখানা। চোখে স্থির দৃষ্টি। অন্তরের কাঠিন্য তার মুখাবয়বে। একপা এগিয়ে যায় সে। বলতে থাকে স্পষ্ট দরাজ গলায়—

"যখোন গুষ্টিসমেত মানুষ না খায়ে মরতিছিলাম—বড়োগুলো-নের কথা না হয় ছাড়ে দিলাম, গ্যাদা ছুটোর মুখেও একটা দানা জোটাতি পারি নাই, ত্যাখোনতো এই সভা বসে নাই। বড়ো-

মিঞার পাঁচ সাতটা গোলার থিকে সিকি কাঠা ধানও বারোয় নাই এই মোয়াজ্জেমের জন্যি ?”

“সে সকলকারই খাটে খাতি হয়,” উত্তর দেয় বড়মিঞা, “তুমিও খাটবা, তুমি খাবা।”

“খুব হক্ কথা, খাটেই আমি খাই। হাত আমি পাতিনে। কিন্তুক্ তারও য্যাখোন অভাব হয় ? বড়োমিঞার লতুন গোলাডা বানান হচ্ছিল সে সুময়, কৈ আমাক্‌তো ডাক দেওয়া হয় নাই ? খাটে খাতাম।” বলে একটু থেমেই আরও জোর দিয়ে বলে ওঠে মোয়াজ্জেম, “আমি নেমখাবোম না।” তারপরই স্বরটাকে একটু নামিয়ে এনে বলে, “আমার উত্তর পাইচেন বোধ হয়। এ্যাখোন যাতি পারি ?”

“কিন্তুক্ ভুলে যায়ো না মিঞাসাহেব, তোমার মিয়েরও সাদী দিতি হবি। ছেলেও আমরা একরকম ঠিক ক’রেই রাখিছিলাম। ঐ মকতাবের মষ্টার ; সাদেক আলি—”

“কেডা ?” যাওবার জন্যে পা বাড়াতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় মোয়াজ্জেম।

“সাদেক আলি।”

“তার চাইতে মিয়ের আমার গোর দেব।” বলে আর সেখানে দাঁড়ায় না মোয়াজ্জেম।

সে ইতিহাসের কথা শেষ কবতে না করতেই সুর পালটে যায় অনাথ ঘোষের, “ঐ ছ্যাখেন হুজুর, ধান ভানতি শিবের গীত গাওয়া আরম্ভ করিছি। আমাদের বড়কর্তা একদিন আপনার পায়ের ধূলো আশা করেন তাঁর কুঁড়ায়। এ্যাখোন কবে যাবেন যদি বলেন হুজুর, বড়কর্তা গাড়ির ব্যবস্থা করতি পারেন।”

“যেতে হবে ?” বলেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন মহিমবাবু। কি একটা চিন্তা, স্পষ্ট নয় অথচ আচ্ছন্ন ক’রে রেখেছে মনটাকে। সেই ভাবেই উত্তর দেন, “রবিবার সকালে যাব।”

তারপর আর খেয়াল করেননি কখন নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল অনাথ ঘোষ।

খালিশপুর থেকে কাঞ্চনপুর প্রায় এক মাইল রাস্তা। প্রয়োজন হয়না গাড়ির। কিন্তু বাসুদেববাবু সম্মান দেখাতে কখন ভুল করেন না। আরোহী দু'জনকে নিয়ে এগুতে থাকে গাড়ি। রাস্তার কিছুটা আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আর কিছুটা মাঠের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন মহিমবাবু। কিন্তু পরিদৃশ্যমান গ্রামের চেহারার বদলে চোখের ওপরে ভেসে উঠছিল বড়মিঞার মূর্ত্তিখানি। সর্পচক্ষু এই মানুষটির ছোবল থেকে কি উপায়ে বাঁচানো যেতে পারে মোয়াজ্জেমকে।

"অনাথবাবু তো অনেক খোঁজ খবর রাখেন," হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীর মুখের দিকে তাকান মহিমবাবু, "সামসুলের ঘটনা কিছু জানা আছে আপনার ?"

"সামসুল, মানে ঐ মুকসুদ মিঞার জামাই ?"

"হ্যা, তার কথাই জিজ্ঞাসা করছি। ও যে ইসমাইলের জমি রক্ষা করতে গেল, তারপর কি হল ?"

"আজ্ঞে, তারপরই তো আসল ঘটনা," বলে আরম্ভ করে অনাথ ঘোষ অতীতের আর কয়েকখানি পৃষ্ঠা শোনাতে—

সামসুল খোঁজে দুষমণ। আর বড়মিঞা খোঁজে শুয়োর। হাতে বন্দুক, চোখে সতর্ক দৃষ্টি, নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে যায় শস্যক্ষেত্রের এধার থেকে ওধার। মেলে না। অথচ পরদিন ধান-ক্ষেতের জায়গায় জায়গায় পাওয়া যায় তার অত্যাচারের ছাপ। এদিকে সামসুলও রোজই খবর পায় ইসমাইলের জমির ধান কাটতে আসছে লোকে। ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় সে জমির ওপরে। অপেক্ষা করতে থাকে এক মোক্ষম মোকাবিলার। কিন্তু কোথায়

ধান কাটবার মনিষ ? বৃথাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা মাঠে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসে সে।

ওপক্ষ আর এগুবেনা জেনে এবারে সামসুলই মনিষ ঠিক করে সেই জমির ধান কাটিয়ে তুলবার। লোকজন ঠিক ক'রে সবে ঘরে ফিরেছে সে, ঠিক সেই সময়ে খবর পায় লোক নেমেছে জমিতে। দিনের হাসি হাসি মুখ সবে তখন ম্লান হয়ে এসেছে। যেতেও হবে বেশ কিছুটা পথ। কিন্তু এ খবরের পর আর দেরি করা চলে না। সড়কির বাণ্ডিল থেকে কয়েকখানা টান দিয়ে নিয়ে ছুটে চলতে থাকে সেই জমি লক্ষ্য ক'রে।

মাঠের বুকেও নেমেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। নির্দ্দিষ্ট জমি থেকে কিছুটা দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে যায় সামসুল। দৃষ্টিটাকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রে দেখতে চেষ্টা করে সে, কোনও মানুষ দেখা যায় কিনা মাঠের বুকে। দেখা যায় না কোনও মানুষের মূর্ত্তি। শুধু দূর থেকে কাছে, এধার থেকে ওধার দৃষ্টি চালনা করবার মুখে মনে হয় ইসমাইলের জমির একপাশের ধানগাছগুলো একটু অস্বাভাবিক ভাবে নড়ছে। উত্তেজনায় টান হয়ে ওঠে সামসুলের দেহ। শয়তানরা তাহলে গা আড়াল দিয়ে বসে কাজ সারছে! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে সেও। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে ক্ষেতের ভেতরে। সর্ সর্ করে এগিয়ে যেতে থাকে তার লক্ষ্যের দিকে। আসন্ন সংগ্রামের উত্তেজনায় ফুলে উঠেছে তার শিরা উপশিরা। ঘন ঘন বইছে শ্বাস। ধান গাছের ধারাল পাতায় আঁচড়ে যাচ্ছে তার দেহের নগ্নভাগ। তবুও ভ্রুক্ষেপহীন এগিয়ে চলতে থাকে সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

কিন্তু শেষ লক্ষ্যে গিয়ে আর পৌঁছুতে পারেনা সে। একটা বিরাট আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে ওঠে মাঠের বাতাস। আর তারই সঙ্গে ওঠে এক বিকট চীৎকার। দুটি শব্দতরঙ্গ মিলে মিশে একাকার হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ চরের মাঠের বুকে। মুহূর্ত্ত

মাত্র। তারপরই ধানক্ষেতের ভেতর থেকে জেগে ওঠে কয়টি মাথা। আর প্রায় গজ ত্রিশ দূর থেকে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসে বড়মিঞা। হাতের বন্দুক আছড়ে ফেলে আঁতিপাতি ক'রে খুঁজতে থাকে ধানক্ষেতের যে ধার থেকে উঠেছিল সেই মরণ চীৎকার। খোঁজে আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে গালাগালি দেয় যারা নির্বাক পাষাণ-মূর্ত্তির মত ধানক্ষেতের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের।

"খাড়ায়ে খাড়ায়ে রূপ দেখতিছ জানোয়ারের দল? খুঁজতি পারনা? শুয়োর মনে করে কার জান আমি খতম্ করলাম, কেডা জানে!"

ধম্‌কানি খেয়ে এগিয়ে আসে তারা। পাকা ফসলের ক্ষেত তছনছ ক'রে খুঁজতে থাকে একটি দেহ। তারা একদিকে, বড়মিঞা আর এক দিকে। হঠাৎ কিসে পা আটকে পড়ে যায় বড়মিঞা। চম্‌কে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে যার হাতের সঙ্গে পা বেধে পড়ে গিয়েছিল, তারই দেহের ওপরে। মাথা কুটতে থাকে, "হায় আল্লা, এ আমি কি করলাম।" আর বিস্ময়ের ধাক্কায় বিস্ফারিত চোখ, দাঁড়িয়ে থাকে মনিষ কয়জন। নির্বাক, নিস্পন্দ।

বন্দুকের শব্দে সচকিত হয়ে উঠেছিল কুমার নদীর বাঁকের মুখে ছোট্ট পাড়ার কুটির কয়খানিও। ছুটে আসে সেখানকার বাসীন্দারা মৃত বরাহ দর্শনাকাঙ্খায়।

"পুলিশ আল। নিয়ে গেল লাস। সঙ্গে নিয়ে গেল হত্যাকারীকও, মাজায় দড়ি দিয়ে। কিন্তু তার আগেই বীজ পোঁতা হয়ে গেছে এক বিষবৃক্ষের," বলতে থাকে আনাথ ঘোষ—

খবর পেয়ে পাগলের ম'ত ছুটে আসে খাদিজা। দুরন্ত এই মানুষটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না তার। কিন্তু বলতেও পারত না কিছু। বলতে গেলেই এমন ভাবে তাকাতো সামসুল যে

খাদিজার মনে হত সে বুঝি ঐ মানুষটির সর্বস্ব হরণ করছে। তাছাড়া মনের নিভৃত কোনে একটু অহঙ্কারও ছিল খাদিজার। সামসুলের সু-নাম হিন্দু মুসলমান সকলের মুখে। সকলেই জানে গৃহী হয়েও সে গৃহবাসী নয়। থাকে থাকে হঠাৎ কোথায় উধাও হ'য়ে যায়। যেন নিঃশেষে মুছে যায় দুনিয়ার বুক থেকে। তারপর যেমন ডুবেছিল তেমনিই একদিন ভুস ক'রে জেগে ওঠে। বাঁধন ছেঁড়া মানুষটাকে ফিরতে দেখে খাদিজার মনের ভেতরকার গুমরিয়ে মরা অভিমানটা মাথা চাগিয়ে উঠতে চায়। কিন্তু বলতে পারে না একটি কথাও। আদরে আব্দারে অস্থির ক'রে তুলে তালগোল পাকিয়ে দেয় তার অন্তরের অক্ষরগুলিকে। খেয়ালী মানুষটার কাঁধে মাথা রেখে অঝরে কাঁদতে থাকে সে।

সেই খাদিজা খবর শুনেই আথালি পাথালি হ'য়ে ছুটে আসে যেখানে ঘটে গিয়েছে তার চরম সর্বনাশ। আত্মীয় স্বজন দু'চারজন ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিল তাকে। কিন্তু তার বিষম ধাক্কার মুখে দাঁড়াতে পারেনি তারা। সর্বস্ব হারাবার ব্যথায় উন্মাদ সে। ছুটে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সামসুলের দেহের ওপরে। অসম্বৃত বসন। নিঃসন্তানা রমনীর যৌবনপুষ্ট দেহ অংশে অংশে দেখা যায় নিকটস্থ কুটীরবাসীদের আনা লণ্ঠনের আলোয়। ধীরে ধীরে সামসুলের মাথার কাছে গিয়ে বসে বড়োমিঞা। চোখের দু'কোল বেয়ে জলের ধারা পড়ছে গড়িয়ে। গলার স্বরে কান্নার জড়তা। বলে, "আমাক্ তুমি শাস্তি দ্যাও। ঐ বন্দুক আছে এখান, একটা গুলি কর আমাক্। অন্ধকারের মধ্যি শুয়োর ভাবে—" আর কথা এগোয় না তার। নিজের ওপরেই এক অসীম আক্রোশে দু'হাতে টেনে ছিঁড়তে থাকে নিজের মাথার চুল। আক্ষেপের মাঝখানেই হঠাৎ স্থির হয়ে যায় বড়মিঞা। শান্ত গভীর দৃষ্টিতে তাকায় খাদিজার মুখের দিকে। স্থিরপ্রতিজ্ঞের মতই বলতে থাকে,

"আল্লার নাম নিয়ে কচ্ছি, য্যাদ্দিন আমার একমুঠো জুটবি ত্যাদ্দিন পর্যন্ত তুমার কোন অভাব আমি থাকতি দেব না। যে গুনাহ্ আজ করলাম তার প্রাচিত্তির আমি করবই।"

কথা শুনে মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করে একবার খাদিজা। তারপরই নিজের বেশবাস ঠিক ক'রে নিয়ে স্বামীর পায়ের কাছে সরে বসে। একটি কাপড়ের পুঁটুলি যেন।

"পুলিস আল। লাসের সঙ্গে খুনীও চালান হ'ল। সবই হ'ল, কিন্তু হলনা কিছুই," বলে চলেছে অনাথ ঘোষ, "বেকসুর খালাস। যারা ধান কাটতি গিছিল তারা সাক্ষী দিল—সামসুলকে তারা আসতি দেখেনি, চীৎকারও শোনেনি। বড়োমিঞা গিছিল শুয়োর মারতি। সঙ্গে ছিল তারা। হঠাৎ কতকগুলো ধানগাছ নড়ে উঠতিই 'ঐ যে শালার শুয়োর' বলেই বন্দুক ফুটায় বড়োমিঞা।"

"অপর পক্ষের সাক্ষী ছিল না?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"ছিল," উত্তর দেয় অনাথ, "তারা পূর্বাপর সমস্তই বলে গেল কিন্তু বলতি পারল না ঘটনার সোময়কার কোনও কথা। আর ধানক্ষেতে যে শুয়োব নামিছিল তা স্বীকার করল সবাই। বড়োমিঞা যে শুয়োর মারতি বন্দুক হাতে পেত্যেক দিন বিকেলবেলা মাঠে যাতো তাও স্বীকার করে বসল উকিলের জেরার জবাবে। তারপর আর মামলা কুথায় থাকে?" বলে থেমে যায় সে। একটু পরে আবার নিজে থেকেই বলে—

"ঘটনা ইখানে নয়, এর পরে।"

এগুতে থাকে কাহিনী—

৩০২ ধারায় ফাঁসটা গলার কাছ থেকে সরে যেতেই ছুটে আসে বড়োমিঞা। আইনের মুক্তি দৈহিক মুক্তি। আত্মিক? ধুলো পায়েই ছুটে যায় সে মুকসুদ মিঞার বাড়ি, মথুরাপুরে। বৃদ্ধ মানুষ, আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে সামসুলএর অপমৃত্যুর আঘাতে। স্বামুর

মত পড়ে থাকে বারান্দার এককোণে। মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যটুকু করবার ইচ্ছাটাও সে হারিয়ে ফেলেছে। বাড়ির মানুষ কেউ যদি আসে সে কথা বলতে, বিরক্ত হয়। মুখ ঘুরিয়ে বসে। দুর্বল সে শুধু খাদিজা আর হামিদার কাছে। দুই মেয়ের ভাগ্যলিপি দুই রকম। আর তার জন্যে নিজেকেই দোষ দেয় মুকস্সুদ মিঞা। নিজে দেখে শুনে পছন্দ ক'রে বিয়ে দিয়েছিল দুই মেয়ের। বেলা চড়ে যাচ্ছে দেখে হামিদা এসে দাঁড়ায় তার বাবার সামনে। একখানা হাত চেপে ধরে।

"বা-জান, চ্যান করবার বেলা হইছে।"

মেয়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে উঠতে যাচ্ছিল মুকস্সুদ। এমন সময় বাড়ির ভেতরে বড়মিঞাকে ঢুকতে দেখে আবার চেপে বসে পড়ে। তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে ঢুকে যায় হামিদা।

বাড়ির ভেতরে পা দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে যায় বড়মিঞা। তারপরই ছুটে এসে আছড়ে পড়ে মুকস্সুদ মিঞার পায়ের কাছে। নির্বাক মুখ, সবাক চোখ তার অবিরত ক্ষমা চেয়ে চলেছে তারই অস্ত্রে বিক্ষত একটি হৃদয়ের কাছে। মুকস্সুদ মিঞাও বাক্য-হারা। নিশ্চুপ বসে থাকে আসমানের দিকে তাকিয়ে। যেন ওখানকার অধিবাসী তার খোদাতাল্লার কাছ থেকে নির্দেশ চাইছে, কি করবে সে এখন। তারপর ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাসের বোঝা বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে, "মিঞা, বাড়ি যাও।"

উঠে বসে বড়মিঞা। আনত দৃষ্টি। বলে, "যাব, কিন্তুক্ আবার আসার অনুমতিডা চাই।"

"কি হবি অনুমতি দিয়ে?" বৃদ্ধের বুকে আবার এক অজানা ভয়ের কাঁপন।

"এ ভার আমিই নিতি চাই। তাছাড়া তায়েবের একটা কিছু করা লাগবিত'?" বলে উঠে দাঁড়ায় বড়মিঞা। বিশেষ শ্রদ্ধাভরে আদাব জানিয়ে বিদায় নেয় তখনকার মত।

"তায়েব বুঝি খাদিজাদের ভাই ?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"হ্যাঁ, ঐ একই ভাই উয়েদের।" উত্তর দিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে অনাথ, "কয়কডা দিনের ভিতরিই কলকাতা থিকে নতুন একখান সাইকেল আল তায়েবের জন্যি। নতুন সাইকেল পায়ে আহ্লাদে আটখানা তায়েব আর ভয়ে মুখ শুকায়ে যায় তার তুই বোনের। এই নতুন পদ্ধতিতে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুটা কি, তা বুঝে উঠতি পারেনা তারা। অপেক্ষা করতি থাকে তুরু তুরু বুকে।"

পুরো একটি বছর ধরে চলে এই প্রতীক্ষার পালা। সদা সতর্ক হ'য়ে চলা। অঢেল সাহায্য বড়মিঞার। তবু যেন সংসারের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসতে থাকে। সংসারের সাহায্যকারী হয়নি তায়েব। হয়েছে এক বিরাট সুড়ঙ্গ। ভাল ছেলে। বাপের একমাত্র নির্ভর স্থল। কি ক'রে যে নেশাভাঙ্গ করা শিখল—যা পায় তু'হাতের কাছে, তাই চলে যায় তার নেশার গর্ভে। শেষে একদিন বিরক্ত হয়েই মুকসুদ মিঞাকে বলে বড়মিঞা, "আমি ঢাললি হবি কি ? সবই তো যায় আদাড়ে। এক কাজ করেন। খাদিজার নিকে দেন, সোম্‌সারের ভার একটু কমবি তাতে।"

"ভাবতিছি," বিড়বিড় ক'রে বলে মুকসুদ মিঞা।

"হ', তাই করেন।" বলে উঠে পড়ে বড়মিঞা।

মুকসুদ মিঞার বাড়ি ছাড়িয়ে একটু গেলেই দেখা যায় তু'তিনটি পোড়ো ভিটে। এককালে ইয়ারালির বাস ছিল এখানে। লম্বা দড়িপাকান চেহারায় চোখ তুটো জ্বল-জ্বল করে। নেশায় আরক্তিম সব সময়ে। বৎসরের পর বৎসর খাজনা বাকী। দেবার চেষ্টা নেই। সকাল হতেই ক'মাইল রাস্তা পেরিয়ে ছোটে বড়মিঞার বাড়ি। ফাই-ফরমায়েস খাটে। পায় তু'মুটো ভাত আর শুকনো নেশার কয়টি পয়সা। কেনা গোলাম বড়মিঞার।

সেই ইয়ারালির বাড়ি যখন বাকী খাজনার দায়ে ডিক্রী হ'য়ে

গেল, বড়মিঞাই তাকে নিয়ে গিয়ে বসাল দক্ষিণ চরে, নিজের ইজারা নেওয়া জমির থেকে কয়েক কাঠা দিয়ে। ছিল এক বৌ আর এক ছেলে। স্বামীর সংশোধনের অপেক্ষায় থেকে থেকে শেষে হতাশ হ'য়েই বৌটা তালাক দেয় ইয়ারালিকে। ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সে নাকি ভিন্ গাঁয়ের একজনকে নিকে ক'রে এখন সুখেই আছে।

ইয়ারালির ভিটে ছাড়িয়েই একটা আম বাগান। তারপরেই ছোট একটুকরো মাঠ। কয়েকটা কুল আর বাবলা গাছ তার বুকে। শীতকালে কুলের প্রলোভনে জমে ওঠে স্থানটি পাড়ার ছেলেদের কলরোলে। অন্য সময়ে গরু ছাগলের চারণ ভূমি। আম বাগানের শেষ মাথায় এসেই দাঁড়িয়ে পড়তে হয় বড়মিঞাকে। ওধার থেকে একটা ছাগলের গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে খাদিজা। দৃষ্টি তার বড়মিঞার মুখের ওপরে নিবদ্ধ। কি কথা সে চোখে বুঝতে পারে না বড়মিঞা। যেটুকু স্পষ্ট, সেটুকু হচ্ছে এক তীব্র প্রতিবাদ।

এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বড়মিঞার মুখোমুখি। স্পষ্ট, ধীর এবং গম্ভীর গলায় বলে, "আমি নিকে করব না।"

"কে কলো নিকে করতি?" হাসি হাসি মুখ বড়মিঞার। আর কিছু না হ'ক, মুখত' ফুটেছে খাদিজার এতদিনে।

"তুমি।"

অকস্মাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যায় মুখের হাসি। কিন্তু সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে বড়মিঞা, "কি করবা থাইলে?"

"কিচ্ছু না। সর যাই।" পাশ কাটিয়ে যেতে যায় খাদিজা।

"যৈবনডার মাথা খায়ে লাভডা কি?"

এগুতে গিয়ে থেমে যায় খাদিজা। মুখটা ঘুরিয়ে একমুহূর্তের জন্যে তাকায় বক্তার দিকে, তারপরই বলে ওঠে, "এ যৈবন কিনতি হলি মিঞার কলজের সবটুকুন্ খুনই বার ক'রে দিতি হবি।" বলে

আর দাঁড়ায় না সেখানে। শ্রোতার মুখের ভাবটা দেখবার জন্যে ফিরে তাকায়ও না একবার।

"কিন্তু বড় খেলোয়াড়ের কেরামতিই সেই জায়গায় যে বিনা খুনেই কার্যোদ্ধার ক'রে নেয় সে," বলে এ পরিচ্ছদের এখানেই দাঁড়ি টেনে দেয় অনাথ ঘোষ, "বড়কর্তার বাড়ি আসে গেল হুজুর।"

একটা সরকারী অফিস থাকাতে খালিশপুরের গায়ে যেটুকু আধুনিকতার ছাপ পড়েছে কাঞ্চনপুরের তাও নেই। চৌধুরীদের বাড়িটা নেই বলে ধরে নিলে এ যেন চিন্তাহরণবাবুদের গ্রামের উন্মুক্ত পিঠ বলে মনে হয়। রোদ হওয়া লেগে এটা শুক্‌নো আর সেটা ছিল তারই অভাবে স্যাঁতসেঁতে। সেখানে ছিল ভিজে জমিতে জন্মান আগাছার জঙ্গল আর এখানে আম, কাঠাল, বাঁশঝাড়েব প্রাচুর্য।

বেড়ান, গল্প, তারপর দ্বিপ্রাহরিকের কাজও শেষ হয়। মন্দ লাগছেনা একঘেয়ে সংসার জীবন থেকে একটা দিনের ছুটি নিয়ে। দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে সেই কথাই চিন্তা করছিলেন। এমন সময় মনে হয় এধার দিয়েওত' মথুরাপুর যাওয়া যায়। আর গাড়ি যখন রয়েছে তখন একবার ঘুরে এলে মন্দ হয় না। খেয়াল হ'তেই বাসুদেববাবুকে বলে অনাথ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গী হিসাবে মন্দ নয় মানুষটা। খবরও রাখে অনেক কিছুর।

মথুরাপুরে পৌছেই জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু, "অনাথবাবু, প্রতুলবাবুর বাড়িটা চেনেন নিশ্চয়ই, সেই স্বদেশী রেল ডাকাতিতে ধরা পড়ে জেল হ'য়েছে যাঁর?"

"জানি।"

"কে আছে বাড়ীতে ?"

"থাকার মধ্যি এক বুড়ি মা। তবে গিয়ে রাস্তাটা—অবিশ্যি বেশিদূর না। মুকসুদ মিঞার বাড়ীর কাঞ্চি দিয়ে একটা সরুমত রাস্তা আছে—" বলতে বলতে এগিয়ে চলতে থাকে অনাথ ঘোষ, "একটুধ্যেন নুংড়াটুংড়া হয়, তা দিনির বেলা, দেখে চললিই হবিনি।"

এঁকিয়ে বেঁকিয়ে এ বাগান ও বাগান ক'রে একটা ছোট মাঠও পাড়ি দিয়ে শেষে এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় অনাথ ঘোষ। সামনেই একটা বাড়ি। খান দুই ঘর। বে-মেরামতে সঙ্কীর্ণ অবস্থা। দেখে মনে হয় না যে কোনও মানুষ বাস করে এখানে। ক'পা এগিয়ে যান মহিমবাবু। জীর্ণ বেড়ার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করেন। যেটুকু দেখা যায় তাইতেই আশ্চর্য হয়ে যান তিনি। পয়সা খরচের ব্যাপার নেই বাড়ির যে অংশেটুকুতে সেখানেই একটি সুরুচি সম্পন্ন হাতের ছাপ। সুন্দর ভাবে নিকোন উঠোন, ঘরের দাওয়া। উঠোনের মাঝখানে একটি ছোট্ট তুলসী মঞ্চ। এককোণে লাগান হয়েছে কতকগুলি বেগুন আর লঙ্কার চারা। আর একধারে একটি ঝিঙে গাছ তার বাহু মেলতে আরম্ভ করেছে।

চোখ টান দিয়ে নেন মহিমবাবু। হঠাৎ ঘুরে অনাথ ঘোষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন তিনি,"বলতে পারেন অনাথবাবু, প্রতুলবাবুর জমিটাতে কোন গণ্ডগোল ছিল কি না ?"

এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন যে হ'তে হবে, আগেই ভেবেছিল অনাথ ঘোষ। প্রস্তুতও ছিল তার জন্যে। কিন্তু একেবারে হঠাৎ আসাতেই হকচকিয়ে যায় সে। একরকম মুখে ফসকেই বেরিয়ে আসে একটি কথা, "একটুধ্যেন—" আর সঙ্গে সঙ্গেই তার হাত চেপে ধরেন মহিমবাবু, "চলুন।"

"কনে ?" ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছে অনাথ ঘোষের।

"আসুন না আমার সঙ্গে।" তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঢোকেন প্রতুল সেনের বাড়ির ভেতরে। ডাক দেন, "মা—"

"কে?" আনন্দ উত্তেজনাময় একটি উত্তর। তারপরই ঘরের ভেতর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসেন এক বৃদ্ধা। বয়সের চাইতে বার্ধক্য অধিক। হয়ত' পুত্রের চিন্তায় আর দারিদ্রের নিষ্পেষণে। বারান্দার ওপরে এসেই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দিতে যান। দেন না। কি ভেবে নামিয়ে নেন হাতখানা। বলেন, "না বাবা, মা বলে ডেকেছ যখন, তখন তোমার সামনে ঘোমটা দিয়ে অপমান নাই বা করলাম।"

তাই অমন সন্তান সম্ভব, মনে মনে ভাবেন মহিমবাবু। মুখে বলেন না কিছু। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে বসে পড়েন দাওয়ার ওপরেই।

"ওকি বাবা, মাটিতে?" ব্যস্ত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধা।

"ওটা কিন্তু সৎমার মত কথা হ'ল।"

হেসে ওঠেন বৃদ্ধা এবং মহিমবাবু দু'জনেই একসঙ্গে। আর অনাথ ঘোষ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে মহিমবাবুর এই হুজুবজন-দুর্লভ রকম সকম দেখে।

জমে উঠতেই যা দেরি। জমলে দিল খোলা। রাখ ঢাক নেই প্রতুলবাবুর মায়ের কাছে। কথাও বলেন না কাউকে ভয় ক'রে। আলোচনার মাধ্যমে জমিদারের জমি দান করবার কথা উঠতেই বলে ওঠেন, "কানা গরু বামুনকে দান—ও কথা আর বলো না। পুজো করতে কেউ শান্তিপুরী ধুতি দেয়? তখন খোঁজে মোটা ছালা কোথায় আছে। এ জমিও তাই। দিয়ে নামও হ'ল, অথচ খরচও হ'ল না কিছু।" বলে যেতে থাকেন প্রতুলবাবুর মা যুগাতীত কালের এক ইতিহাস।

কুমারের পাড়ে দক্ষিণ চরে যখন প্রজা বসান জমিদার মশায়, তখন তাদের ভেতরে নিজের লাঠিয়ালও বসিয়েছিলেন দু'তিন ঘর। চাকরাণ দিয়েছিলেন কয়েক বিঘা করে জমি। ইসমাইলের বাবাও ছিল সেই লাঠিয়ালদেরই একজন। ইসমাইল তখন ছোট। লাজুক, শান্ত প্রকৃতির ছেলেটিকে যে দেখত সেই ভালবাসত। একবার ঐ দক্ষিণ চরেরই একটা অংশ নিয়ে 'কাজে' হয়। মথুরাপুরের জমিদার একদিকে, অপর দিকে শালুকদির জমিদার। সেই কাজেতেই মারা গেল ইসমাইলের বাবা। ও পক্ষের নমঃ-সর্দার মনোহরের নাম শুনলে বুক কেঁপে উঠত বড় বড় সর্দারের। বুক কেঁপেছিল ইসমাইলের বাবারও। চার হাত পায়ে যার সড়কি চলে তার সঙ্গে কাজে করা যার তার কাজ নয়। তবুও যেতেই হবে। এই তার অন্ন। গেল, কিন্তু আর ফিরল না। ইসমাইল মনে গুমরোয়, মুখে বলে না কোনও কথা। চাষ আবাদ করে, তাছাড়া কি সব ব্যবসাও নাকি করে বড়মিঞার সঙ্গে। চাকচিক্য যেমন নেই, তেমনি আবার দীনতাও নেই কিছু। মোটামুটি ভাবে চলে যায় সংসার। ছেলে ভাল দেখে ওরই সঙ্গে মুকসুদ মিঞা হামিদার বিয়েও দিল। হৈ হুল্লোড় করল সকলেই। হামিদাও খুশি। কিন্তু সব দিন কখন একভাবে যায় না। নির্মল আকাশে নামে মেঘের ছায়া। ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল ইসমাইল। কিছু দিনের ভেতরেই জানতে পারা গেল কোন এক ডাকাতের দলে যোগ দিয়েছে সে।

"সামনা সামনি আক্রমণকে অনেকে ভয় পায় না, কিন্তু ডাকাতের দলকে ভয় পায়। তার কারণ তারা রাত্রে হঠাৎ একসঙ্গে অনেকে আক্রমণ করে, তাই নয় কি বাবা?" জিজ্ঞাসা ক'রেই আবার বলতে থাকেন বৃদ্ধা উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই, "ইসমাইলকে দেখে ভয় পেতে আরম্ভ করল অনেকেই। ও-ও তাই চায়। প্রথমেই জবর দখল করল ঐ ১৫ বিঘে

জমি। ওদের চাকরাণ পাওয়া জমির গায়ে লাগা কিনা, তাই।"

"জমিটা কার ছিল ?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"খালিশপুরের ক্ষীরোদ মজুমদারের। লোকটা সুদী ব্যবসাদার। কে যেন টাকা ধার নিয়ে শোধ দিতে পারেনি, তার বদলে লিখে দিয়েছে জমিটা। নইলে জমি কিনে টাকা আটকে রাখবার মত মানুষ সে নয়। যাই হ'ক, তারপর শোন—" এতক্ষণে আসল ঘটনায় এসে প্রবেশ কবেন বৃদ্ধা। বলতে থাকেন—

একদিন শুধু ক্ষীরোদ মজুমদারের বাড়িতে গিয়েছিল ইসমাইল। ভূমিকা নেই, নেই কোন কুশল প্রশ্ন। সোজা গিয়ে দাঁড়িয়েই একটি কথা—"উই দক্ষিণ চরে আপনার যে জমিডা আছে, উডা আমার।"

কথা শুনে মুখ তুলে একবার তাকিয়েই আবার মনঃসংযোগ করে ক্ষীরোদ মজুমদার তার হিসাবের খাতায়, "বেশত, টাকাডা দিয়ে যাও।"

"দের্বানে," বলেই পিছন ফেরে ইসমাইল, "রাত্তির বেলা আসে। আমার নাম ইসমাইল।" হাঁটতে থাকে সে।

নামটা যেন গলায় আটকে যায় মজুমদারের। কোন রকমে গল-নালীর সেই রুদ্ধ ভাবটাকে সরল ক'রে নিয়েই চীৎকার ক'রে ওঠে মজুমদার, "এই, শোন, শোন—"

"কি, কন।" ফিরে আসে ইসমাইল।

"তা ন্যাও," উদারতায় গলে পড়ে মজুমদার, "ভারিতো, কয় বিঘে জমি। আমি কই কি, এ্যাকেবারে কাছারী-বাড়ি যায়ে ডোল করায়ে ন্যাও।"

"সে দেখা যাবিনি পরে," আরও গম্ভীর হ'য়ে যায় ইসমাইল, "আপনার বাড়ি যে ডাকাতি হবিনে, তার জন্যি খাজনাডা বছর বছর দিয়ে দিবেন।" বলেই হাঁটা দেয় সে।

"প্রাণের দায়ে ক'বছর খাজনা দিয়েওছিল মজুমদার। তারপর ১৯০৭ সালে যখন ইসমাইলের জেল হয়, তখনই সে জমিটা বিক্রী ক'রে দেয় উত্তর চরের একজনের কাছে। জানত না যে ইসমাইলের জেল হয়েছে ছ'মাসের জন্তে।" একটু থেমে, দম নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করেন প্রতুলবাবুর মা, "সে বেচারী কাছারী-বাড়ি থেকে ডোল করিয়ে জমিটা নিজের নামে খাজনা পত্তন করিয়ে নেবারও সময় পেলে না। ভেবে দেখ একবার কাণ্ডখানা বাবা, জমি কিনল একজন, জমিদারের ঘরের প্রজা হ'য়ে রইল আর একজন, আর ভোগ করে এক ডাকাতে।" এই পর্যন্ত বলেই থেমে যান তিনি। একটানা এতক্ষণ ধরে কথা বলায় বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে বিশ্রামের সময় দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে অনাথ ঘোষের মুখের ওপরে চোখ পড়তেই মহিমবাবু দেখেন শুকনো মুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে বেচারী। ভয়ের চিহ্নগুলি অত্যন্ত সুপষ্ট। মনে মনে হাসেন তিনি। রাগতে পারেন বৈকি জমিদার এবং তাঁর ভক্ত অনুচরের দল। এতবড় বদান্যতার এতখানি শূন্যগর্ভতা প্রকাশে দ্বিতীয় রিপুর আক্রমণই স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিক অনাথ ঘোষের ভয় পাওয়া। কবে কম্মে যেখানে যেতে হয় সেখানে এই ধরণের সাক্ষী হওয়া মানে নিজের বিপদই শুধু ডেকে আনা।

"১৯০৭ সালের শেষ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত চলল এই টানা পোড়েন, বুঝলে বাবা," অনেকটা সুস্থির হ'য়ে আবার বলতে সুরু করেন প্রতুল সেনের মা, "১৯০৯ সালে আবার জেল হ'ল ইসমাইলের। চার বছরের মেয়াদ।"

"এবারত' আর ডাকাত থাকল না," মহিমবাবু বলে ওঠেন।

"না, তা থাকল না বটে, তবে যা রেখে গেল তা ডাকাতের বাবা। ইসমাইল ধরা পড়ে যশোর রেজিষ্ট্রী আপিসে, যেদিন ঐ ১৫ বিঘে জমি বড়মিঞার নামে রেজিষ্ট্রী ক'রে দেয়।.........

রেজিষ্ট্রী করানেই হয় না, জমিদারের ঘর থেকে প্রজাপত্তনা করিয়ে নিতে হয়। তা নেওয়া হয়নি একজনেরও, এদিকে জমি চলেছে হাতের পর হাত ঘুরে।" বলে একটু থেমেই জোর দিয়ে বলে উঠলেন বৃদ্ধা, "ঐ সাত ভেজালের জাম ঢাক ঢোল পিটিয়ে মহিমময় জমিদার দান করলেন আমার ছেলেকে।" একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেলেন তিনি। মহিমবাবুর মনে হ'ল এইখানেই এ আলোচনার ইতি ক'রে দিলেন প্রতুলবাবুর মা। অতএব ওঠাই সমীচীন, ভাবছেন, অথচ মনের ভেতরে একটু খুঁৎ খুঁতে ভাব। প্রতুলবাবুর জমি রেজিস্ট্রী করবার কথাটা শোনা হয়নি এখনও। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকবার পর জিজ্ঞাসা করেই ফেলেন কথাটা।

"এটাত' তোমারই ভাল জানবার কথা বাবা। জেলে বসে দলিল রেজিস্ট্রীত' রোজ একটা ক'রে হয় না যে ভুলে যাবে।"

উত্তর শুনে লজ্জা পেয়ে যান মহিমবাবু। জানাই বটে তাঁর। এক বছর আগে জেলা সদরের জেলখানায় বসে একটা দলিল রেজিস্ট্রী করান বটে প্রতুলবাবু। ডাকাতি মামলার আসামী, তাই অতটা গুরুত্ব দেননি বিষয়টির। আর তারই নকল কেটে নিতে গিয়েছিল মুকসুদ মিঞা। কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাস্য এ ছিল না। প্রতুল-বাবু কেন বনমালী দাসের নামে দান পত্র লিখে দিলেন তাই ছিল তাঁর জিজ্ঞাস্য। প্রশ্নটি ঠিক ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

"তার কারণ বনমালাই হচ্ছে ঐ জমির প্রকৃত মালিক। সে কিনে নিয়েছিল ওটা মজুমদারের কাছ থেকে। তাছাড়া, যতবারই হাত ফেরতা হ'ক না কেন, সবই হ'য়েছে অন্যায় ক'রে। অন্যায় নয়? তুমিই বলত' বাবা?" বলেই ঘরের ভেতরে চলে যান বৃদ্ধা। সেখান থেকেই বলেন, "চলে যেওনা বাবা। এসেছ অতিথি হ'য়ে, অন্ততঃ দুটো বাতাসা মুখে দিয়ে যাবে।"

অবহেলা করতে পারেননি মহিমবাবু সে আতিথেয়তা।

এক জ্বালায় পড়েছিলেন মতিমবাবু। পাড়ার বিরেশ্বরবাবুর কৃপায় তাঁর সাধের ফুল বাগান পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছিল প্রতিদিন সকালে। মুখ খুলে বলতেও পারেন না কিছু, আবার সহ্যও হয়না এই পুষ্পচয়ন। আপন অঙ্গনটুকু শাকসব্জিতে ভরিয়ে অপরের মাথা মুড়িয়ে কোন পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে এই মানুষটির, বুঝে পান না তিনি। বিরেশ্বরবাবুর চোখের পর্দার বালাই নেই। হে হে ক'রে হেসে বলেন, "বেশ ফুল, খাসা ফুল। প্রতিদিন সকালে বাবা বিশ্বনাথের পুজো করিতো, বেশ আনন্দ পাই মনে।"

দেখে দেখে আর সহ্য হয় না। এ যেন ছাগ বলি দিয়ে নিজের মনস্কামনা সিদ্ধির ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একজনের প্রাণ যায় আর একজন পুণ্য সঞ্চয় করে। পুষ্পহীন গাছগুলির সামনে দাঁড়িয়ে থা। যায়না আবার অন্দরে গিয়ে দাঁড়াবারও রাস্তা নাই। ঝাঁঝিয়ে ওঠেন লক্ষ্মীদেবী—"কেন, মুখ ফুটে বলতে পারনা ছুটো কথা? বুড়োমদ্দ তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন এসে ফুল তুলে নিয়ে যাবে, একি ওর জমিদারী পেয়েছে নাকি? যাওনা, ওর বাগান মুড়িয়ে তরকারী নিয়ে এস। দেখবে, একদিনেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।"

বলা যায় অনেক কিছু, করা যায় না তার একভাগও। অন্তরের জ্বালা পুষে রাখতে হয় চক্ষুলজ্জার কুলুপ এঁটে। একটু যে পরামর্শ করবেন, সে উপায়ও নেই। মোয়াজ্জেম আসছেনা আজ কয়েকদিন। গো-সেবার কাজটুকু ইমামই এসে কোনরকমে সেরে দিয়ে যায়। কিশোর বয়স। তাছাড়া এসব কাজ করেওনি কোনদিন। বিশেষ করে দোহন কাজ। অসাবধানতায় দুধের বালতি যায় উল্টে। অতি সাবধানতায় দুধ পাওয়া যায় কম। ইমামের বাবাকে উদ্দেশ্য করে বুলি ছাড়েন লক্ষ্মীদেবী, "কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। স্বার্থ মিটেছে, আর দরকার কি আসবার।" শেষ হয় না এখানেই। জগাইএর নাম উঠলে

মাধাই আসে সঙ্গে। মোয়াজ্জেমে আরম্ভ, মহিমবাবুতে শেষ। চলছিল লক্ষ্মীদেবীর মুখ, সোজা বাঁকা, ভাষার বিভিন্ন রাস্তা ধরে। এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে আসে বিরেশ্বরবাবুর গলা— জয় শিব শিবম্, শিব কল্পতরুম্। অদ্ভুত সেই ধাতব-কণ্ঠস্বর কানে যেতেই স্তব্ধগতি হয়ে যায় লক্ষ্মীদেবীর ভাষা-মন্দাকিনী। তির্যক-দৃষ্টিতে একবার দেখে নেন সত্ত আক্রান্ত মানুষটিকে, তারপরই অবগুণ্ঠন-ভাগ সামান্য একটু বাড়িয়ে দিয়েই দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়ান বাইরের বারান্দায়। বিরেশ্বরবাবু তখন হিসাব ক'রে চলেছেন কতটুকু সম্ভারের ব্যবস্থা হবে আজ তাঁর এই সংগ্রহশালা থেকে।

"মেশোমশায়, ঐ চামেলি গাছটায় আজ প্রথম ফুল ফুটেছে, ও ক'টা তুলে নিন। প্রথম ফল, বাবার পুজোয় লাগবে।"

প্রথম সম্ভাষণে একটু চমকেই উঠেছিলেন বিরেশ্বরবাবু। তারপর এই স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া শ্যালিকা পুত্রীর কথা শুনে তিনিও হ'য়ে ওঠেন সহজ, জড়তা দোষ মুক্ত। কি একটা কথা বলতে চেষ্টা করেন লক্ষ্মীদেবীর কথার পৃষ্ঠে, কিন্তু সে সুযোগ আর পান না। তার আগেই বলে যেতে থাকেন লক্ষ্মীদেবী, "আর ঐ যে গোলাপ [illegible], এখন দেখুন, আজ মাত্র দুটি ফুল দিয়েছে। তাহ'ক, আপনি নিয়ে যান। বাবা বিশ্বনাথের পুজোয় যদি না না লাগল, তা'হলে ফুল হয়ে ফোটবার দরকারটা কি? কি বলেন মেশোমশায়? জানেন মেশোমশায়, উনি কলকাতায় চিঠি লিখে দিয়েছেন আরও অনেক রকম ফুলের চারা পাঠিয়ে দিতে।"

"বল কি মা?" বিরেশ্বরবাবুর আশ্চর্যের অভিব্যক্তিটা এই বাগিচার অধিকারিণীকে খুশি করবার জন্যে হলেও অন্তরে অন্তরেও তিনি কম আশ্চর্য হন না।

"ব[illegible]র [illegible]গাতে হবে না? বাবা বিশ্বনাথ আমাদের

আশীর্বাদ করলেন আর আমরা তাঁর পুজোর জন্যে ফুলের ব্যবস্থা করবনা ?"

প্রথম পুষ্পটি বৃন্তচ্যুত করতে গিয়েছিলেন বিরেশ্বরবাবু। লক্ষ্মীদেবীর কথা কয়টি কানে যেতেই থেমে যায় হাত। জানা, শোনা এবং স্বপ্নেরও অগোচর যা, তাই যে তাঁকে শুনতে হবে আজ একটি মেয়ের মুখ থেকে, এ তিনি ধারণাও করতে পারেননি। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "আশীর্বাদ করলেন কি রকম ?"

"হ্যাঁ, তাইত' করলেন। আমরা দুজনেই না, স্বপ্ন দেখছি," শিশুর সারল্য নিয়ে বলতে থাকেন লক্ষ্মীদেবী, "দেখলাম, বাবা বিশ্বনাথ এসে আশীর্বাদ করলেন আমাদের। বললেন, তোদের নিজেদের পরিশ্রমের সৃষ্টি এই ফুল পেয়ে আমি অত্যন্ত প্রীত। আশীর্বাদ করি তোরা সুখি হ', সমৃদ্ধি লাভ কর।"

যে সারল্য নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন, শেষের দিকে এসে আর থাকে না তা। ভাবাবেগের কম্পন তাঁর স্বরে। নিমীলিত দুটি চোখ। বলেই চলেছিলেন তাঁর স্বপ্ন-লব্ধ আশীর্বাদের কথা। হয়ত' চলত আরও কিছুক্ষণ যদি না মূর্ত্তিমান বিঘ্নসৃষ্টিকারীর মত বলে উঠতেন মহিমবাবু, "এভাবে মানুষটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কোন মানে হয় ?"

চোখ খুলে বাগানটার দিকে একবার তাকিয়েই ফোঁস ক'রে ওঠেন লক্ষ্মীদেবী, "না, তাড়িয়ে দেবে কেন। রোজ রোজ এসে বাগান উজোড় করতে বলবে!" বলেই এই অক্ষম মানুষটিকে কৃতিত্বের কটাক্ষে বিঁধে রেখে হন্ হন্ করে ঘরের ভেতরে চলে যান তিনি।

অন্য কোনও সময়ে হলে হয়ত' এ কটাক্ষের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করতেন না মহিমবাবু। কিন্তু এখন এই মূহুর্ত্তটিতে লক্ষ্মীদেবী অনন্যা হয়ে ওঠেন তাঁর কাছে। সাধের বাগানটির দিকে তাকিয়ে মনের সেই ভাবটিকেই উপভোগ করছিলেন। এমন সময় বিশেষ

উত্তেজিত ভাবে এসে দাঁড়ায় কয়েকজন লোক। মুখ কারও পরিচিত, কারও নয়। দলটি এসে গেটের কাছে দাঁড়াতেই একজন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "শিগ্‌গীর একবার চলেন হুজুর। মোয়াজ্জেম সব্বোনাশ করে ফেলিছে।"

"বড়মিঞাক্ মারে ফেলিছে মোয়াজ্জেম।" আর একজন একটু বিশদভাবে বলে, "কোঁৎকার এক ঘাঁই মাথা জাঁতে বসাতিই কোঁক্ ক'রে উঠেই কাটা কলাগাছের নাহাল আছড়ায়ে পড়ল বড়মিঞা। তা'পর আর লড়েও না, চড়েও না। আপনে শিগ্‌গীর চলেন হুজুর। আপনের কথাই ক'ল মোয়াজ্জেম—বাবাক্ খপোর দে।" আশাভরা দৃষ্টি নিয়ে লোকটি তাকিয়ে থাকে মহিমবাবুর মুখের দিকে।

খবরটি শুধু অভাবনীয় নয়, অসম্ভব বলেই মনে হয় মহিমবাবুর। অথচ এতগুলি লোকের কথাকে অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কি তিনি করবেন এখন? কিইবা ক'রতে পারেন, ভাবতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে অবসরও বিশেষ মেলেনা। অস্থির ভাবে কোলাহল ক'রে ওঠে লোকগুলি। বিচার বিবেচনার ধার ধারেনা তারা। মোয়াজ্জেমের ব্যাপার যেখানে, হুজুরকে সেখানে যেতেই হবে, এই তাদের শেষ বুঝ। দোটানায় পড়ে যান মহিমবাবু। যাবেন, কি যাবেন না। ওদিকে থেকে থেকেই তাগাদা দিচ্ছে লোকগুলি। শেষ অবধি তাদেরই জেদে একরকম অব্যবস্থিত চিত্তেই রওনা হ'তে হয় তাঁকে।

অনেকদিনই গিয়েছেন তিনি দক্ষিণ চরের দিকে বেড়াতে। কিন্তু তার যে কোনও সংক্ষিপ্ত পথ আছে তা জানা ছিলনা তাঁর। গাঁয়ের মানুষ ওরা, যে পথে নিয়ে চলে তাঁকে সে পথ এতদিন অনাবিষ্কৃতই ছিল তাঁর কাছে। মাথায় চিন্তার রাশি। পথের শোভা দেখবার মত অবস্থা নয়। একটা সুস্থচিত্ত মানুষ কি করে এমন একটি কাজ করে বসল, সেই চিন্তাই উতলা ক'রে তুলেছে তাঁকে।

"শালার জানুয়ার—" কে যেন চাপতে পারে না আর অন্তরের ক্রোধকে।

চমকে উঠে মানুষটার দিকে তাকান মহিমবাবু। আগে আগে চলেছে। মুখ দেখা যায় না। পিছন থেকে দেখেই বোঝা যায় হাড়ে চামড়ায় দড়িয়ে যাওয়া চেহারা। মানুষটা ঠিক চেনা নয় তাঁর। তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না লোকটির। আপন মনেই বকে চলেছে সে, "জানুয়ারের প্যাঁচের উপর প্যাঁচ কষে আমার সঙ্গি নিকে দিল খাদিজার। কও, নিকে দবকারডা কি ছিল? তুই নিকে করতি পারবিনে? না হয় নইছিলই, কলজের সবখেনি খুন লাগবি উয়েক্ নিকে করতি। তাই বুলে একডা মিয়েছেলেক্ নষ্ট করবি তুই?" লোকটির দড়িয়ে যাওয়া দেহখানি রাগে ফুলে উঠতে চায়। পারেনা দৈহিক অক্ষমতায়। আর তাই কণ্ঠস্বরের তীব্রতার ভেতর দিয়েই প্রকাশ পেতে থাকে তা।

এতক্ষণে বুঝতে পারেন মহিমবাবু এই লোকটিই হচ্ছে খাদিজার নিকে করা খসম্ ইয়ারালি। মনের যে অবস্থাটিকে এতদিন অতি সাবধানে চেপে রাখতে হয়েছিল এই মানুষটিকে, আজ তাই প্রকাশ পাচ্ছে ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধের ভেতর দিয়ে, বিশেষ ভয়ের কারণটি দূর হওয়ার সাহসে।

"আর কি করে নিকে দিল আমার সঙ্গি! উরি আল্লা— তায়েরডাক্ নিশাভাঙ্গ করা শিখাল পেথমেই, তা'পর মিঞাসাহেবেক্ ট্যাকা দেয় আর লিখায়ে নেয়। এই ক'রে ক'রে যখন ডুবে যাতি বসল সে, তখনগে চাপ দিল—ইয়ারালির সঙ্গি নিকে দাও খাদিজার। বাপেক্ বাঁচাতি মিয়েডা ত্যাখন আর কি করে?"

না হয় নাইবা থাকল সম্বন্ধ, তাহ'লেও ধর্ম্মতঃ, আইনতঃ খাদিজা তার বিবি। নির্য্যাতিতা নিঃসহায়া এই স্ত্রীলোকটির প্রতি সহানুভূতিশীল ইয়ারালি বলে যেতে থাকে, "ইদিক হামিদা নাই। হঠাৎ একদিন জেল-খালাস ইসমাইল ফিরে আসে

হামিদাক্ নিয়ে চলে গেছে। কুথায় সে গেছে, কেউ জানে না। তয় চলে যাওয়ার আগে নাকি জমিদার মশা'র সঙ্গি দেখা করিছিল। খুব একান্তরালে কি সব কথাবার্ত্তাউ নাকি হইছিল দুইজনার মধ্যি।"

থামে না ইয়ারালি। কানে চাপা দেওয়া ছাগল ছানার মত নির্জীব হয়ে পড়েছিল সে এতগুলি বৎসর ধরে। আজ সেই চাপা সরে যাওয়ায় মুক্তির আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে সে। শুধু এক চিন্তা—নেশা। তা সে যাহ'ক ক'রে মিলেই যাবে। তবুও গলার কাছটিতে সব সময়ে ক্ষুর ধরেত' আর থাকবেনা কেউ।

পথ চলেন, শোনেন আর মুকস্সুদ মিঞার কাহিনীর অশ্রুত অংশটুকু পরপর সাজিয়ে গেঁথে নিতে থাকেন মহিমবাবু, আপন মনের সংগ্রহশালায় তাকে ধরে রাখবেন বলে।

একা খাদিজা। অক্ষম বৃদ্ধ বাপের মুখের দিকে তাকায় আর আপন ভাগ্যের কথা চিন্তা করে। তায়েবটা যদি মানুষ হ'ত তাহ'লেও বুকে কিছু বল পেত সে। সে রাস্তায় আগেই কাঁটা দিয়েছে বড়মিঞা। এই ইয়ারালির সঙ্গেই ভিড়িয়ে দিয়ে নেশা করতে শিখিয়েছে তাকে। এখন সে ঘর চেনেনা, আত্মীয় স্বজন চেনেনা, চেনে শুধু একটি মাত্র জিনিস, সে নেশা। যতক্ষণ বিশেষ জানাজানি না হয় ততক্ষণই সঙ্কোচ, জানাজানি হ'তেই বেপরোয়া। নামবার পথ শুধু পিছল নয়, আপাতঃ সুখদায়কও বটে।

তায়েব অমানুষ। হামিদা নেই। এদিকে বড়মিঞার চাপ। নিজেকে নিঃশেষে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেবার আগে একবার শুধু ডুকরে কেঁদে ওঠে। তারপরই শান্ত হয়ে যায়।

হ'য়ে গেল নিকে। ইয়ারালির দক্ষিণ চরের বাড়িতে চলে গেল খাদিজা। একা নয়, বৃদ্ধ বাপ সঙ্গে। তবুও মনের কোনে একটু সান্ত্বনা তার, হ'ক ইয়ারালি মানুষ হিসাবে অবাঞ্ছিত, বড়মিঞাত' নয়। আর দোষ দেয় নিজের নসীবকে। বদ্‌নসীবই যদি না হবে

তাহ'লে এ অবস্থা আজ হবে কেন তার। মথুরাপুর থেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসা ছাগলটাকে একটা খুঁটোয় বেঁধে রেখে গিয়ে বসে কুমারের পাড়ে। সামনের প্রবহমান জলরাশির দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে, মানুষের জীবন কেন এমন সহজ স্বচ্ছন্দ-গতি হয় না।

এমনিই একদিন কুমারের পাড়ে বসে আছে খাদিজা, মাথায় চিন্তায় বোঝা। সুসংবদ্ধ নয়। ছাড়া ছাড়া। নিজের জীবন কাহিনীর কত স্মৃতি, কত সমস্যা, ভবিষ্যতের ভাবনা। আর তার মাঝে নিঃসীম একাকীত্বের এক অনির্বচনীয় ব্যথা। বিভোর সে, জানতেও পারেনি কখন আর একজন এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে। হঠাৎ কাঁধের ওপরে হাতের স্পর্শ পেতেই চমকে ওঠে সে। মুহূর্তে পিছন ফিরে তাকিয়েই দারুভূত হ'য়ে যায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মানুষটার মুখের দিকে। অবশ, অচল।

"এ্যাখোন আমি কি ক'রে বাঁচাই বলতি পার?" নরম স্বরে বড়মিঞার সহানুভূতির প্রকাশ। তবুও কোন উত্তর দেয়না খাদিজা। নির্ভাবনা হওয়ার মত এখনও কিছু পায়নি সে।

"আমি কচ্ছিলাম ঐ তায়েবের কথা," আরও একটু স্পষ্ট হয় বড়মিঞা, "চুরি করতি যায়ে ধরা পড়িছে। এ্যাখন উয়েক্ বাঁচাই কি ক'রে?"

"চুরি করিছে?" কোনরকমে গলা দিয়ে এই দুটি শব্দই যেন বের করতে পারে খাদিজা।

"তাইত' কই। এই খবর শুনলি মিঞাসাহেবত' আর বাঁচবিনে।"

এতক্ষণ এ কথাটা স্মরণেই আসেনি খাদিজার। বড়মিঞা মনে করিয়ে দিতেই অস্থির হ'য়ে ওঠে সে। কিছু নয়, তবুও সব কিছু তার ঐ এক বুড়ো বাপ। সে গেলে যে আর কিছুই থাকল না তার! আর কাকে নিয়ে বাঁচবে সে? কেমন করে বাঁচবে?

ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে বড়মিঞার মুখের দিকে। তারপরই হু হু ক'রে কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরে তারই পা দু'খানা যে তাকে তার কামনা চরিতার্থের যন্ত্ররূপে পেতে চায়।

কয়েকটা মুহূর্ত্ত সময় নেয় বড়মিঞা পরিস্থিতিটাকে ঠিকভাবে সইয়ে নিতে। অভ্যস্ত নয় মানবতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে। তারপরই মুখে বিজেতার হাসি, গলায় অদ্ভুত এক নরম সোহাগের সুর এনে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, "বিবি, য্যাদ্দিন আমি রইছি ত্যাদ্দিন তুমাগরে কোন চিন্তা নাই।"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে একটু পিছিয়ে মহিমবাবুর পাশাপাশি এসে বলতে থাকে ইয়ারালি, "হুজুর, ট্যাকা পালি মাও ছাওয়ালের শোক ভুলে যায়। ই এ্যামুনই এক জিনিস। তবো কথা হচ্ছে ইয়ের মধ্যি আমিও একটুখ্যেন জড়ায়ে ছিলাম। তা হুজুর, আমি হলাম বড়মিঞার কুদালের আছাড়ি। ভাল থাকলি রাখল, ফাটে গেলি ফালায়ে দিয়ে লতুন একখান নাগালো। বড়মিঞা ছোট্ট একখান ঘর তুলল ওখেনে আর আমার উপুর হুকুম হ'ল দিবরাজ-পুরি উয়ের বায়বার ঘরে থাকতি।"

"তায়েবের কি হল?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"কি আবার হবি?" উত্তর দেয় ইয়ারালি, "চুরি করিছিল তায়েব ঠিকই, ধরাও পড়িছিল। তা বড়মিঞা হাত ঝাড়তিই মিটে গেল সব।····· ইসবতো হচ্ছে উয়ের কাছে তাসের খেলা। উস্তাদ যাদুকরের এইবার বড় খেল্ আরম্ভন হল। হুজুর, আমরা মানুষ না, দুটেক দুটেক খাই আর নিশা করে পড়ে থাকি। কিন্তুক্ কারুর ক্ষেতি করিনে। আর উই ট্যাকাউলা মানুষডা—" বলে আরম্ভ করতে গিয়ে কথাগুলো যেন আটকে যায় ইয়ারালির গলায়। মুখে চোখে এক বিজাতীয় ঘৃণার ভাব। রোমানদের নামোচ্চারণ করতে যে ভাব ফুটে উঠত ক্রীতদাসদের মুখের ওপরে অথবা খেয়ালী তৈমুরলঙ্গের খেয়ালের খেলার হুকুম শুনে মনের যে

ছবি ফুটে উঠত তার প্রজাদের মুখে চোখে, এ সেই ভাব। একটা জোর ঝাঁকি দিয়ে বলে ওঠে সে, "উই ট্যাকাউলা মানুষডা মান্ষের ক্ষেতি ছাড়া আর কিছু বোঝে না। কি করে কার অনেষ্ট করবি তারই ফিকিরে ঘোরে সব সুময়। ইসমাইলের জমিন্তো ধারের নাম করে লিয়ে লিলই। ট্যাকা নাই উয়ের, সুনামও নাই। কেউ আগায়ে আলোনা একটা ফয়সলা করতি। বাধ্য হয়েই চলে গেল সে এই গাঁও ছাড়ে। যাক্ গে যাক্, আপদ বিদেয় হয়ছে, ভালই হয়ছে। কিন্তুক্ স্যানবাবু? উনার জমিন্ তুই নিতি যাস্ কি বলে? মানুষডা হিন্দু বোঝে না, মোছলমান বোঝে না—"

বাধা পড়ে ইয়ারালির উত্তেজনায়।

"ও জমিত' আর প্রতুলবাবুর নয়," বলে ওঠেন মহিমবাবু।

"তয়?" ইয়ারালি যেন আকাশ থেকে পড়ে মহিমবাবুর কথা শুনে।

"ও জমি প্রতুলবাবু উত্তর চরের বনমালী দাসকে দান ক'রে দিয়েছেন।"

"তাই কন,' লাফিয়ে ওঠে ইয়রালি, "আমুউত' তাই কই, স্যানবাবুর দলিল কাটায় ক্যান্ বড়মিঞা। ...ঘোর শত্তুরতাই উই বনমালী দাসের সঙ্গি বড়মিঞার। যাক্ গে' যাক্, সে আর এক গাওনা। আসল কথা হচ্ছে বনমালীর কাছে তার নিজির দলিল লাইকো। সিডা আগেই হাঁতাইছে। এ্যাখন নকলডা কাটাতি পারলিই ইসমাইলের জমিন্ আর ঐ ১৫ বিঘে মিলে বেশ মুটা একলপ্ত জমিন্ হ'য়ে যায়। তারই জন্যি ঘাঁটঘুট বাঁধে আগাতি থাকে বড়মিঞা। শোনেন হুজুর—"

ইয়ারালির অত বড় 'শোনেন হুজুর' শুনে ভেবেছিলেন মহিমবাবু যে, যে ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল, দস্যু রত্নাকরের ইতিবৃত্ত থেকে, তাই বুঝি এতদিনে এসে পৌঁছুল আসল ঘটনায়। কিন্তু একটু শুনেই বুঝতে পারেন, স্বভাবগুণে ইয়ারালি চলেছে আর এক

রাস্তা ধরে। নেশাখোর মানুষ, সহজ পদক্ষেপ তার আয়ত্তাধীন নয়। তবুও নিঃশব্দে শুনে যেতে থাকেন তিনি। হৃ'ক বিক্ষিপ্ত। অপ্রকাশত' আর থাকবে না। পরিচয়ত' পাওয়া যাবে আরও কয়টি মনের।

"বোঝেন হুজুর, আমার বিবি আর আমিই লাকচ। বড়মিঞা নিশার পয়সা দেহে বাড়ায়ে। কিন্তুক্ মনের মধ্যি যার আর এক নিশা, এ নিশা তার ট্যাকেই থাকে। অন্ধকার হলি বড়মিঞা বারোয় তো আমিউ বারোই। এইতো কঞ্চির নাহাল শরীল," বলেই খ্যাক্ খ্যাক্ করে একটু হেসে নেয় ইয়ারালি তার নিজের রসিকতায়, তারপব আবার বলতে থাকে, "আঁধার হলি আর দেখা যায়না। বড়মিঞা যায় লদীর পাড় পাড় দিয়ে, আমি যাই সুজা রাস্তায়। ঘাপটি মারে থাকি বাড়ির এক কাণ্ডিতে।·· যাই আর আসি, যাই আর আসি। ঘণ্টা খ্যানেক চোং চোং করে শ্যাষে ফিরে আসে বড়মিঞা। দুঃখুও হয় হুজুর, অহম্কারও হয়। বিবি আমার শালটির থাম। ভাঙতি পারতো ভাঙে ফ্যালাও, মচ্কানো চল্‌বিনে।

······কিন্তুক্ বড়মিঞাও তেমনি ঘড়েল। কয়ডা দিন ঘুরেই নিজির মন্তর পড়ল।"

"নিজের মন্ত্রটা কি?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

"ঐ যে কয়—চোরেক্ কয় চুরি করতি আর গেরস্তক্ কয় সজাগ থাকতি। ঐ এক মন্তরেই কাত খাদিজা," বলে ইয়ারালি।

"তুই লক্ করতো," পাশ থেকে একজন বলে ওঠে, "লিজের বিবির কথা এ্যামুন ক'রে ক'তি সরম লাগেনা তোর?"

"হয়। ছিনালী করতি লাজ লাগেনা উয়ের আর বললিই আমার হ'ল দোষ।" প্রশ্নকারীর জবাব দিয়েই আবার 'শোনেন হুজুর' বলে শোনাতে থাকে ইয়ারালি—

কামনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। জ্বলছে আর পোড়াচ্ছে

বড়মিঞার ধৈর্যের স্নায়ুগুলোকে। সমস্তটা দিন ধরে জ্বলে আর সন্ধ্যা হ'লেই গিয়ে দাঁড়ায় খাদিজার সামনে। তারপরই তার সমস্ত দাহিকা শক্তি কেমন যেন স্তিমিত হ'য়ে আসে ঐ স্ত্রীলোকটির হিমশীতলতায়। ফিরে আসে বড়মিঞা এক রুদ্ধ প্রস্তর-ফটকের গায়ে মাথা ঠুকে। অচরিতার্থ কামনার বোঝা বুকে বয়ে।

উদগ্র কামনা। ব্যর্থতায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। শেষ রাস্তা ধরে বড়মিঞা তায়েবকে দিয়ে চুরি করিয়ে। চুরিও হ'ল, ধরাও পড়ল, এবং সে খবর নিজেই বহন ক'রে নিয়ে গেল খাদিজার কাছে।

সেই রাত্রের কাহিনীই বলে যেতে থাকে ইয়ারালি। সাক্ষী হয়ে লুকিয়ে ছিল সে নদীর পাড়ের পাশে, একটি ঢিবির আড়ালে।

আশ্বাসবাণী শুনিয়েও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বড়মিঞা। যদি কোনও কথা বলে খাদিজা। কিন্তু ওপক্ষ থেকে কোন উত্তরই আসেনা দেখে ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসে পড়ে নতুন ঘরটির বারান্দায়। এধারে বসেই থাকে খাদিজা অন্ধকারের ভেতরে, গভীরতর অন্ধকারময় এক ভবিষ্যতের ভয়ে দুরু দুরু বুকে। তারপর এক সময় নদীর এপারে ওপারে শেয়ালের প্রহর ঘোষণা আর ? হাতেই উঠে দাড়ায় সে। ক্লান্ত দেহখানাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে চলতে থাকে অন্দরের দিকে।

"সুযোগ বুঝে আমিউ যায়ে দাঁড়ালাম বাড়ির এক কাছিত্। দেখি বাপের জন্যি খাওয়ার নিয়ে গেল রসুই ঘর থিকে। তা'পর আসে বসল দরজার পৈঠের উপুর। মাথাটা বাড়ায়ে তাকালাম লতুন ঘরের দিকে। দেখি বড়মিঞা নাই।" বলেই হঠাৎ থেমে গেল ইয়ারালি। তারপরই আবার সুরপালটে নিয়ে আরম্ভ করল, "হুজুর, দেখাশুনা আমার অল্প। কিন্তুক্ অনেক দেখা শুনো মান্ষেও যদি কয়, সে মিয়েছেলের মন বুঝতি পারে, আমি কবো সে ডাঁহা মিথ্যুক। উরা ভাবে এক, করে অন্য কাম। উয়েদের মন যা চায়,

মুখ তার উল্টোডা চায়ে বসে। এই ছ্যাখেন হুজুর—" উদাহরণ দিতে থাকে ইয়ারালি—

ঘরের ভেতরে ছিন্ন মলিন শয্যার ওপরে বসে ব্যথা জর্জরিত মুকস্থদ মিঞা। আর তার দিকে পিছন দিয়ে দোর গোড়ায় বসে খাদিজা। অতি ধীরে নিঃশব্দে কাটতে থাকে রাত। এতগুলি গৃহস্থের বাস এই পল্লীতে, কিন্তু কারও সঙ্গে নেই এদের সহজ সংযোগ। সমাজ যদি বৃক্ষ হয়। এরা আজ বৃক্ষচ্যুত ফল। রটনার রজ্জু দিয়ে বাঁধা বড়মিঞার গতায়াত এবং সাহায্যের আকশি এদের টেনে নামিয়েছে ছিন্নবৃন্ত ক'রে। সম্বন্ধ স্থাপনের আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

গভীর থেকে গভীরতর হ'তে থাকে রাত। গ্রাম-উপান্ত থেকে ভেসে আসে একক শৃগালের রাত্রি দ্বিতীয় যাম শেষের প্রথম সঙ্কেতধ্বনি। তারপরই শোনা যায় সে সঙ্কেতের সমর্থন সূচক মিলিত-ডাক ধানক্ষেতে, কুমারের চরে, গ্রামের ভেতরে। অনতি-দূরের কুমারের জল চিক্ চিক্ করছে জলভরা চোখের মত। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় খাদিজা।

"কনে যাস্?" বৃদ্ধ মুকস্থদের ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়।

"যাইনে। আসতিছি। ক্যান্, ভয় করবিনি?" জিজ্ঞাসা করে খাদিজা।

"নাঃ, ভয়ডা আর কিসির।" উত্তর আসে ঘরের ভেতর থেকে। সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাসের টানা শব্দ।

দাঁড়ায় না আর খাদিজা। রান্নার ছাপড়াটির পাশ দিয়ে যে ছোট্ট রাস্তাটি সে বানিয়ে নিয়েছে কুমারে যাওয়ার জন্যে, সেই রাস্তা ধরে নেমে যেতে থাকে নদীর দিকে। দৃঢ়পদে।

শুকনো মাটির শেষ, জলের আরম্ভ। পায়ের পাতায় জলের স্পর্শ। মুহূর্তের জন্যে একটু থেমে যায় খাদিজা। তারপরই এগুতে থাকে সে। স্থিরপ্রতিজ্ঞ মনের চেহারা প্রকাশ পায় তার প্রতি

পদক্ষেপে। ধীরে ধীরে দেহের নিম্নাংশটুকু গ্রাস ক'রে ফেলে কুমার। তবুও এগুতেই থাকে সে। পিছিয়ে আর সে যাবে না। টুকরো টুকরো হ'য়ে যাওয়া জীবনের খণ্ডগুলি কোনও প্রকারে জোড়া লাগিয়ে আর বেঁচে থাকতে চায় না সে।

আবক্ষ নিমজ্জিত অবস্থায় আর একবার দাঁড়ায় খাদিজা। শেষের আগের শেষ দেখা দেখে নিতে তার এই নিয়ত আঘাতদাত্রী পৃথিবীকে। পিছন ফিরতেই চম্‌কে ওঠে সে। অতিকষ্টে ঢালু পাড় বেয়ে নেমে আসছে মুকসুদ। ভয়ে কেঁপে ওঠে তার বুক—বা-জানও কি তাহ'লে তারই মত—আর ভাবতে পারে না সে। চীৎকার ক'রে ওঠে—"বা-জান, খাড়াও—"

কোনও উত্তর আসে না মুকসুদের তরফ থেকে। নামতেই থাকে, যেমন নামছিল। পড়ে থাকে পিছনে খাদিজার শেষ বিদায় নেওয়া। দ্রুত উঠতে থাকে সে ডাঙার দিকে। জলের অংশ যত কমতে থাকে ততই দ্রুত হ'তে থাকে তার গতি। জল শেষ হতেই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে মুকসুদকে—"বা-জান, কনে যাও ?"

"তুই যেখানে যাস্‌।" থর্‌থর্‌ কাঁপছে মুকসুদের দেহ। পরিশ্রমে, উত্তেজনায়।

"না, না, আমি কুথাও যাবনা, আমি কুথাও যাব না বা-জান, তোমাক্‌ ছাড়ে আমি কুথাও যাতি পারব না।" বাপের বুকে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে ওঠে খাদিজা। আর বৃদ্ধ বাপ তার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা কন্যাটির মাথার ওপরে শ্বেত শ্মশ্রু বহুল মুখখানি রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'চোখের কোল বেয়ে তার গড়িয়ে পড়তে থাকে বহু বৎসরের জমাট বাঁধা অশ্রুর বিগলিত ধারা।

"অচথ"—বলে বেশ জোর দিয়ে আরম্ভ করতে গিয়েই স্বর নামিয়ে নেয় ইয়ারালি, "এই বাঁও দিক হুজুর। আসে গেলাম বলে।" থেমে যায় সে। জোর ধরতাইএর মুখেই ভিন্ন প্রসঙ্গ এসে পড়ায় সুর কেটে গিয়েছে তার। কয়েক পা নীরবেই অতিক্রম

ক'রে যান মহিমবাবু। তারপর বেশ খাদেই ধরে ইয়ারালি, "আল্লা বানাইছে মিয়েছেলে আর মানষে বানাইছে ট্যাকা। কতি পারেন হুজুর, কোনডে বড় আর কোনড়ে ছোট ?"

প্রশ্নটি শুনে কয়টি মুখ ভেসে ওঠে মহিমবাবুর মনের পর্দায় —বড়মিঞা, মোয়াজ্জেম, কাবলী আর শহীদান। আর একটি চরিত্রের কথাও মনে পড়ে তাঁর। আয়েজান বিবি। কেউ সংযমে মহীয়ান, কেউ অসংযমে ঘৃণ্য।

"অচথ", উত্তর না পেয়ে নিজেই বলতে আরম্ভ করে ইয়ারালি, "পরদিন থিকেই দেখা গেল খাদিজা য্যান এক লতুন মানুষ হইছে। বড়মিঞা গেলি কি খুশি—পিঁড়ে পাতে দেয়, ছাগলের দুধ দোয়ায়ে জ্বাল দিয়ে খাতি দেয়—গুজুর গুজুর ফিস্ ফিসেনি—এ্যাদ্দিন মরে নাই খাদিজা, এইবারেই ম'ল সে শুধু বুড়ো বাপের দিক তাকাতি যায়ে। এক একবার ইচ্ছে হয় ছুটে যায়ে বড়মিঞার মাথায় বসায়ে দি' এককোপ। আবার ভাবি, মিয়েছেলে যদি খারাপ হয় ; ব্যাটাছেলের দোষডা কনে !" একটা জোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝাঁকি দিয়ে বলে ওঠে সে, "যাকগে মরুকগে। আমি ভাবলাম এইবেরেই বুঝি বড়মিঞার ঘড়েলপনা শেষ হল। যার জন্যি এত লাফাঝাঁফি তাত' মিলেই গেছে। ...... হায় আল্লা, দু'তিনডে মাসও গেল না, দেখি, আবার চাকু শানাচ্ছে। ক্যান যে শানায়, কার যে গলায় বসাবি, ভাবে অস্থির হয়ে যাই আর তক্কে তক্কে ঘুরি, কি ক'রে সবটা জানা যায়। জানলামও হুজুর, কিন্তুক্ ত্যাখোন সে আপনের হাতের মধ্যি।"

"কি রকম ?" জিজ্ঞাসা করেন মহিমবাবু।

উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে চলল ইয়ারালি—

কি যেন একটা গোলমাল হ'য়েছিল খাদিজার সঙ্গে বড়মিঞার, ঠিক জানে না সে। তবে হয়েছিল যে বড় রকমই একটা কিছু, তা স্পষ্টই বোঝা গেল বড়মিঞার এবারকার কাজে। বার্দ্ধক্যে প্রায়

স্থবির মুকস্থদ মিঞা। পৃথিবীর প্রলোভন কাটিয়ে এখন সে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। একমাত্র দুর্বল স্থান খাদিজা। বৃদ্ধের সমস্ত বুকখানি জুড়ে ঐ একটি মানুষেরই বাস। সেখানকার তারে সামান্য আঘাত অনুরণিত হ'য়ে উঠবে তার বুকে অত্যন্ত সজোরে। তারই প্রস্তুতি নেয় বড়মিঞা। হিসাবে নির্ভুল সে।

ছাগলটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না খাদিজা। খুঁটোয় বাঁধা ছিল কুমারের পাড়ে। কি ক'রে যে দড়ি খুলে পালাল, বুঝে পায় না সে। ভাবনাটা এত প্রবল যে কার্য কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময় মেলেনা তার। এগিয়ে যেতে থাকে পাড়ের ওপর দিয়ে। যায়, দাঁড়ায়, 'আ , আয়' বলে ডাক দেয়, তারপর এদিক ওদিক দেখে আবার এগুতে থাকে। গলার ভেতরে দলা পাকিয়ে উঠছে কান্নার বেগ। বাষ্পের পর্দায় ঢাকা চোখে অন্ধকারের নিঃসীমতাকে দিচ্ছে বাড়িয়ে। চোখ মুছে অতি সাবধানে এগুতে এগুতে পল্লীর প্রায় শেষে এসে দাঁড়িয়ে যায় খাদিজা। এতদূর বয়ে এসেছে খুঁজে পাওয়ার আশায়। এবারে বসে পড়ে সে তার অতি প্রিয় ছাগটিকে হারাবার অবসাদে। অন্তর বোঝে এ কারও শত্রুতা। কিন্তু দোষারোপ করবার রাস্তা নেই। দু' হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে নীরবে কাঁদতে থাকে সে। ব্যথিত, বিক্ষুব্ধ আর অসহায়।

অশ্রু-স্নায়ুর শ্রান্তিতে কান্নার প্রশমন। এমন সময় চোখ মুছে উঠে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সে। কয়েক পা মাত্র। তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে যায়। পাড়ের ওপরে একটা কি যেন চিক্‌চিক্ করছে। অন্ধকারের ভেতরেও স্পষ্ট দেখা যায় তার রূপোলী আভা। একপা একপা ক'রে এগিয়ে যায়। হাত তুলে নেয় জিনিসটা। চোখের কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। বেশ ভারি। কিন্তু কার? ঘুরে সব চাইতে কাছের বাড়িটির দিকে চলে সে। এক পা, দু'পা, পায়ে পায়ে এগিয়েই চলেছে সে। এ চলার পথ যেন অনন্তকালেও ফুরোবে না তার। মাথার

ভেতরে কেমন তাল গোল পাকিয়ে গিয়েছে সব। ঠিক বুঝেও উঠতে পারছে না, কি যেন হয়ে গেল। কারা যেন 'চোর চোর' বলে চীৎকার ক'রে ছুটে এসে চেপে ধরল তাকে। ঝাঁকি দিয়ে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনের স্ত্রীলোকটির মুখের ওপরেই মেরে বসেছিল ঐ হারছড়া দিয়ে। তারপরই কয়েকটা কিল এসে পড়ল তার মুখে মাথায় পিঠে। তারপর কি যে হ'ল, কেমন ক'রে যে বাড়িতে ফিরল—

"বা-জান!" এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে খাদিজা। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না কিছু।

"বা-জান ঐ ঘরে। কথা কয়োনা এ্যাখোন। লক্ ক'রে শুয়ে থাক।" মাথার কাছ থেকে কে বলল কথাগুলি, দেখতে না পেলেও বুঝতে কষ্ট হয় না খাদিজার। আরও বোঝে, সে বড়মিঞার সাধের তৈরী ছোট ঘরখানিতে শুয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে যায়, পারে না। নেতিয়ে পড়ে নির্জীবের মতো।

"তুমি শুয়ে থাক, আমি মিঞাসাহেবের কাছ থিকে আসতিছি।" বেরিয়ে যায় বড়মিঞা।

উন্মুখ মুকস্থদের কানে ভাসা ভাসা শব্দের ঢেউ জাগে শুধু। কারা যেন এল। কাকে যেন নিয়ে এল। আশায় বসে থাকে সে, খাদিজা এলেই জানা যাবে সব কিছু। কিন্তু সেই যে 'কাজলীডাক্ খুঁজে আনি' বলে গেল মেয়েটা, এখনও ফিরছে না কেন? আর বাইরে ফিস্ ফিস্ করছে কারা! হারাবার ভয়ত' তার কিছুরই নেই, এক খাদিজা ছাড়া। তা সেওত' বাড়িতে নেই এখন। তবে? নিজের মনের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে থাকে সে অন্ধকার ঘরে, একটি জমাট বাঁধা অন্ধকারের মত বসে। এমন সময় কানে আসে খাদিজার ডাক—বা-জান্। উৎকর্ণ মুকস্থদ। ফিরে এসেছে তাহ'লে খাদিজা! কিন্তু এ ঘরে এল না কেন? এগুবার সময় পায় না সে চিন্তা। আর একটি পরিচিত গলার স্বর

শোনা যায়। তাহলে কি ওরা ওঘরে! তাড়াতাড়ি উঠতে যায় মুকস্সুদ মিঞা। পারে না। শ্লথ স্নায়ু। মনের সঙ্গে তাল রেখে কাজ করতে দেয় না দেহকে। ধীরে ধীরে উঠে হাঁতড়ে হাঁতড়ে এগিয়ে যেতে থাকে দরজার দিকে। হঠাৎ কে যেন গতি রোধ করে দাঁড়াল। স্পষ্ট দেখা যায়না, অন্ধকারের একটা কাঠামো শুধু।

"কেডা?" জিজ্ঞাসা করে মুকস্সুদ মিঞা।

"আমি। বসেন, কথা আছে।" এগিয়ে গিয়ে মুকুস্সুদের হাত ধরে বড়মিঞা। সাহায্য করে ফিরে গিয়ে বিছানায় বসতে।

"হুজুর, এক একটা ধাড়ি ইঁদুর আছে যাক্ দেখে বিড়াল সুদ্ধু ভয় পায়। কিন্তুক্ জাঁতিকলে পড়লি সেই ধাড়িও কুপোকাৎ। মুকস্সুদ মিঞাও ইবারে সেই জাঁতিকলে পড়ল হুজুর। মিয়ের মান বাঁচাতি যায়ে বড়মিঞার হাতের পুতুল হ'য়ে পড়ল। আমার যা অবোস্থা, কব কি হুজুর! ঠিক বুঝতি পারতিছিনে কি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তুক্ কিছু যে একটা ঘটতিছে তা বুঝতি কষ্ট হয় না।"

"খাদিজাকে যখন চোর প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করল তখনত' বাধা দিতে পারতে?" ইয়ারালির এই সাক্ষিগোপাল হয়ে থাকা ভাবটাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারেন না মহিমবাবু।

"এখেনে থাকলিতো বাধা দেব। আমাক্ পাঠাইছিল বড় মিঞা মান-ডাঙ্গায়! সিতো যাতি আসতিই এক দিনের রাস্তা।" আপন দায়ীত্বহীনতার দোষ স্খালন করে ইয়ারালি, "পরদিন আসে সব শুনলাম। একবার ভাবলাম, দেই একখান আঁধারে ঘাঁই। আবার ভাবলাম, উরাই যদি কিছু না কয়—যাকগে," বলে যেন সমস্ত আক্রোশ ঝেড়ে ফেলে নির্লিপ্তের মত বলে যেতে থাকে ইয়ারালি, "কয়ডা দিন ধরে শুধু কথাই হল দুই মিঞায়। তারপরই এই কাণ্ড।"

একটি সদ্য ধৃত অপরাধীর মুখ মনে পড়ে মহিমবাবুর। মনে পড়ে তার সেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা 'আল্লা' ডাক।

সে ডাক আর কখনও শোনেননি মহিমবাবু। তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত মাঝি যেন হাল ছেড়ে দিয়ে ডেকে উঠল অসহায়ের শেষ সম্বলকে। নিঃশেষে সঁপে দিল আপনাকে ভাগ্যের নিষ্ঠুর হস্তে।

প্রশ্ন আছে, কিন্তু স্পৃহা নেই। নিঃশব্দে এগিয়ে চলতে থাকেন ওদের প্রদর্শিত পথে। মাঠের বুক মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে সকলে। সকালের সোনালী রোদ আর মায়াময় মনে হয় না। কেমন যেন রূঢ়, ক্ষারময়। স্পর্শে তার জ্বালা।

"আলি সাহেবের মাথা ফাটায়ে তায়েবও পালাইছে গাঁও ছাড়ে।" হঠাৎ বলে ওঠে ইয়ারালি। বেখাপ্‌পা ভাবেই। কিন্তু মহিমবাবুর মনটিকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করল অনেকখানি।

"তা আজ আবার কি হল?" জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

"মুকসুদ মিঞাক্ জামীনে খালাস করে নিয়ে আলোত' বড়মিঞা—এই যে আসে গিছি হুজুর।" থেমে যায় ইয়ারালি। দূর থেকে অনেকগুলি গলার এক মিশ্রিত স্বরের ঢেউ এসে পেঁৗচচ্ছে কানে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছুই। নদীর বাঁকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পল্লীও গিয়েছে বেঁকে। এ মাথায় দাঁড়িয়ে ও মাথার দেখা যায় না কিছুই। শব্দ কানে যেতে গতি আপনিই দ্রুত হয়ে আসে সকলের।

বাড়িটার কাছাকাছি যেতেই কোথা থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ইমাম। কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বিপন্ন বোধ করেন নিজেকে মহিমবাবু। কি বলে সান্ত্বনা দেবেন তিনি এই ছেলেটিকে? বয়স হয়েছে, বুদ্ধি আছে। যা বোঝবার, তা সে আগেই বুঝে নিয়েছে। এখন সান্ত্বনা দিতে যাওয়া মানে নিজেকে খেলো করা। নিঃশব্দে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। তারপর হঠাৎ কি মনে হয় তাঁর, মাথার চুলগুলো মুঠো

ক'রে টেনে ধরে তার দৃষ্টিটা নিজের দিকে ফিরিয়ে বলেন, "বাপের মত শক্ত হ'তে পারিস্ না? দাঁড়া এখানে। চলে যাবি না কোথাও।" বলেই হন্ হন্ করে গিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন।

ছোট ঘরের মেজের ওপরে ওয়ালেৎ হোসেনের স্থির দেহখানি পড়ে। ও ধারের ঘরে নিজের বিছানার ওপরে বৃদ্ধ মুকসুদ মিঞা শুয়ে। এ ঘরের বারান্দার এক কোণে বসে খাদিজা। আর ঘরের দরজার ঠিক সামনে বারন্দার ওপরে বসে মোয়াজ্জেম। ইয়ারালি এসে বসেছে মোয়াজ্জেমের কাছে। কি যেন বলছিল নিচু গলায়, মহিমবাবুকে প্রবেশ করতে দেখেই উঠে দাঁড়ায়। উঠোনের ওপর থেকে একটা ছোট অথচ বেশ শক্ত কাঠের ডাঁট তুলে নিয়ে বলে, "ইয়েরই এক ঘাঁই দিতিই" বলতে গিয়ে নজরটা খাদিজার ওপরে পড়তেই খিঁচিয়ে ওঠে, "এ্যাতই পিরীতের টানত' লক্কা করার দরকারডা কি ছিল? এই যে মানুষডা আজ কয়ডা দিন ধরে জখমি বাঘের হাত থিকে তোক্ বাঁচাবি বলে নিজির কাজ কাম ছাড়ে পাহারা দিতিছে—"

"লক্ কর্ ইয়েরালি।" ধনকের স্বরে বাধা দেয় মোয়াজ্জেম।

"ক্যান্? লক্ করব ক্যান্?" জ্বলে ওঠে ইয়ারালি মেয়াজ্জেমের কথায়, "কয়ডা দিন ধরে উয়েক্ নিজির বাড়ি নিয়ে যায়ে যে আগলে রাখলে তার কি ফলডা হ'ল শুনি? হবি কোনেখেকে? সামসুলের মত মানুষডাক্ যে গুলি ক'রে মারল, তারই সঙ্গি উয়ের যত পিরীত। চরিত্তিরের বালাই থাকলিত' তুমার জন্যি ভাববি।"

"না, না," প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে কেঁদে ওঠে খাদিজা, "আমি সেই মানষেক্ ভুলি নাই, ভুলতি পারব না।" দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে সে। সেই অবস্থাতেই বলতে থাকে, "কারুর সঙ্গি আমার ভাব নাই। মিথ্যে কথা, বানান কথা। শুধু আমাক পাঁড়ানি দিতি—"

"বড়মিঞার সঙ্গি ভাব ছিল না তোর?" ইয়ারালির কঠিন গলার প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠেন মহিমবাবু। ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তিনি, আজই হঠাৎ এই নেশাখোর মানুষটা তার স্বামীত্বের দাবী নিয়ে এমন সজাগ হ'য়ে উঠল কেন? আর যে ঘটনা সম্বন্ধে সে স্থির নিশ্চয় সে সম্বন্ধে এত প্রশ্নই বা করছে কেন?

"না, কুনদিনও না।" মুখ তুলেছে খাদিজা। স্থির দৃষ্টি তার মহিমবাবুর মুখের ওপরে রাখা। সজল সে দৃষ্টি ব্যথা-কাতর কিন্তু কলুষতাহীন বলেই মনে হয় তাঁর। বলে যেতে থাকে সে, "শুধু ভাবের অছিলা দেখায়ে ঠেকায়ে রাখিছিলাম। তা না হলি বা-জানেক্ নিয়ে আমি কুথায় জাতাম হুজুর? বড়ভাই কইছিল তার উখানে যাতি। কিন্তুক্ আমার বিপদ তার ঘাড়ের উপুর চাপায়ে দিতি মন সরে নাই।" আরও কি যেন বলতে যায় খাদিজা, সুযোগ মেলেনা। 'এই সর, সব সব' ধম্‌কানি দিতে দিতে সাইকেল নিয়ে প্রবেশ করেন ভবদেব। তাঁর পিছনে থানার বড় দারোগা এবং সর্বশেষে ডাক্তারবাবু। সাইকেলগুলো বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রেখেই তিনজনে ঢুকে যান ঘরের ভেতরে। ডাক্তারের শেষ জবাবের জন্যে উঠোনের ওপরকার কয়টি মানুষ এবং বাড়ির বাইরের জনতা উদ্‌গ্রীব। তাদের কাউকেই ঢুকতে দেয়নি মোয়াজ্জেম। মরিয়া হ'য়ে লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। তার সে চেহারার দিকে তাকিয়ে আর সাহস পায়নি কেউ। সদ্য একটি মানুষকে খুন করেছে যে তার পক্ষে অসম্ভব নয় কিছুই।

বাইরে বেরিয়ে আসে সকলে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সকলের বুঝেই উত্তর দেন ডাক্তারবাবু, "না, মরেনি। তবে কন্‌কাশান অফ্ দি ব্রেন কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, নাড়া চাড়া করবে না ওকে।. ঠিক যেমন আছে পড়ে থাকবে যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরে আসে। সাক্ষীত' দিতে হবে?" শেষের প্রশ্নটা দারোগাবাবুকেই জিজ্ঞাসা করেন ডাক্তারবাবু।

"তাত, দিতেই হবে।" উত্তর দেন দারোগাবাবু।

নিজের ডাইরীতে প্রয়োজনীয় কথাগুলি লিখে নিয়ে আবার দু'ঘণ্টা পরে আসবেন বলে বিদায় নেন ডাক্তারবাবু।

এবারে দারোগা সাহেবের পালা। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে মহিমবাবুর। খুন করা আর খুনের প্রচেষ্টার ভেতরে প্রভেদ বড় অল্প। তাছাড়া মাজায় দড়ি দিয়ে বেঁধে মানুষটাকে যখন টেনে নিয়ে যাবে, কি ক'রে সান্ত্বনা দেবেন তিনি ইমামকে। সেও এক ভাবনা তাঁর।

একে একে প্রশ্ন ক'রে যেতে থাকেন দারোগাসাহেব। উত্তর কখনও আসে মোয়াজ্জেমের তরফ থেকে, কখনও বা দেয় খাদিজা। ইয়ারালি এখানে একজন নীরব দর্শক শুধু। মহিমবাবুরই মত একজন শ্রোতা। শুধু এ গৃহের মালিক হিসাবে এখানে তার অবস্থিতি।

বলতে থাকে মোয়াজ্জেম দারোগাসাহেবের কথার উত্তরে, "ছোটকর্তার ধমকানিতেই খালুক্ জামীনে খালাস ক'রে নিয়ে আসে বড়মিঞা। কিন্তুক্ আক্রোশে য্যান্ ফাটে পড়্তি থাকে। ত্যাখন আমি ইমামেক্ এখেনে রাখে 'বু'ক নিয়ে গ্যালাম আমার উখানে।"

"বড় ভাই যা করিছে আমার জন্যি তা মানষে ২.রনা হুজুর," হঠাৎ মাঝখান থেকে বলে ওঠে খাদিজা, "আমাক য্যান সব সুময় পাখনা দিয়ে আগলায়ে রাখ্‌তো। তবো নসীব যাবি কনে—" স্বরে ভাঙন ধরে তার, ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে থাকে, "কাল সাঁজের বেল্ ইমাম যায়ে কল যে বা-জানের জ্বর আইচে। কথাডা শুনে আর থাকতি পারি নাই। সারাডা রাত ঘুমাই নাই। ছট্ ফট্ ছট্ ফট্—ভর রাত ছট্ ফট্ করে ভোর রাত্তিরে পালায়ে আইছিলাম বা-জানেক্ দেখতি। কেডা জানতো যে ঐ দুষমনডা ঠিক পাছ নিবি আমার?" একটু দম নেবার জন্যে খাদিজা থামতেই ইয়ারালি

বলে ওঠে, "হুজুর, আমিতো নিশাচর মানুষ। ঘুরে বেড়াই রাত বিরেতে। তা দেখি কি, খাদিজা হন্ হন্ করে চলিছে। আমি ভাবি, এই রাত্তিরে আবার ও বাড়ি ক্যান? তারপরই দেখি হুজুর, বড়মিঞা নিশব্দে আগায়ে চলিছে। দেখেই মেজাজে আগুন ধরে গেলো হুজুর। আমার বিবির পাছু পাছু তুই যাস ক্যা?" কথাটা যেন ঘরের ভেতরে অজ্ঞান মানুষটাকে লক্ষ্য করেই বলে ওঠে ইয়ারালি। 'হাঁ' ক'রে তাকিয়ে আছে মোয়াজ্জেম তার মুখের দিকে। মহিমবাবুও ঠিক বুঝে পাননা এ আবার কোন প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলছে ঘটনাটাকে।

"তোমার বিবি?" জিজ্ঞাসা করেন দারোগা সাহেব।

"জী হুজুর। জিগেন বড়ভাই এর কাছে।"

"উয়েরই বিবি হুজুর," সম্বন্ধ স্বীকার করে মোয়াজ্জেম, "খালু খাদিজার নিকে দিছিল উয়ের সঙ্গি।"

"আমিউ বড়মিঞাব পাছু লিলাম হুজুব" ধীব স্থির গম্ভীর ইয়ারালি স্পষ্ট দরাজ গলায় বলে যেতে থাকে, "মনে মনে ভাবি এথি-মেথি করলি হয় একবাব, তুমাক্ আমি এক ঘ'াইএই পগার পার করাব আজ।" থেমে যায় সে। এক মুহূর্ত্ত। তারপরই দারোগা' সাহেবের সামনে এগিয়ে এসে আরও' জোর দিয়ে বলে ওঠে, "কবকি হুজুর, যা ভাবিছিলাম ঠিক তাই। বাড়ির মধ্যি খাদিজা ঢুকতি না ঢুকতিই মানুষডা য্যান শেবের নাহাল লাফায়ে আসে উয়েক্ টানে নিয়ে আলো এই ঘরের মধ্যি। আমিউ হুজুর, কি য্যান হয়ে গেল আমার, উঠোনের উপুর পড়েছিল এই খাটেডা, ইটাই নিয়ে যায়ে বসায়ে দিলাম এক ঘ'াই।"

থেমে গেল ইয়ারালি। বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগিয়ে গেল সংশ্লিষ্ট মানুষগুলির মনে। চমকে উঠেছেন মহিমবাবুও। হাঁ করে চেয়ে আছেন চিরদিনের নেশাখোর ঐ মানুষটার মুখের দিকে। খুঁজতে থাকেন তাকেই এই মনুষটির ভেতরে, পান না। এর দৃষ্টি আলাদা,

ভাবভঙ্গী পৃথক এক জগতের। সেই আত্মবিক্রীত ইয়ারালি যেন বহুদূরে ফেলে আসা দুঃস্বপ্নে ঘেরা একটি রাত। মুছে গিয়েছে তা চির-পবিত্র সূর্যশিখায়।

কি যেন বলতে যায় মোয়াজ্জেম, কিন্তু আরম্ভও করতে পারে না। "লক্ ক'রে থাকো" বলে এক ধম্‌কানি দিয়ে আরম্ভের পূর্বেই মুখ বন্ধ ক'রে দেয় তার। তারপরই পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তার কাছে। হাত দু' খানা টেনে নেয় মোয়াজ্জেমের।

"খাদিজা থাকল বড় ভাই। উয়েক্ দেখো।"

ঘুরে দাঁড়াতে যায় ইয়ারালি। আর সেই মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে এসে তার পায়ের ওপরে পড়ে খাদিজা, "আমাক্ তুমি এ কুন্ শাস্তি দিয়ে গেলে?"

অঝরে ঝরে পড়তে থাকে তার চোখের জল। যে বৈভব সে হারিয়েছিল একদিন এই দক্ষিণ চরের বুকে, তাই যেন সে ফিরে পেয়েছে আজ, এতদিন পরে, সেই চরেরই মাটিতে।

কি যেন বলতে যায় ইয়ারালি, পারে না। মুখখানা ঘুরিয়ে নিতেই স্পষ্ট দেখতে পান মহিমবাবু, চোখের পাতাগুলো তারও ভিজে। শূন্য জীবন তার। অনাস্বাদিত। তবুও তার ভেতরেই সে যেন পেয়েছে এমন এক মধুরস যা শুধু হৃদয় দিয়ে উপভোগ করবার। মন যার সম্ভোগ-বাসব। হৃদয়ের সেই ভাবরসের উপ্‌চে ওঠা ধারাতেই ভিজে উঠেছে তার চোখের পাতা।

আপন মনের গোপন কুঠুরিটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন মহিমবাবু। থরে থরে সাজান কতকগুলি মূর্ত্তির পাশে আর একটি নূতন মূর্ত্তি সাজান হয়ে গিয়েছে এর ভেতরেই।